দাক্ষিণাত্যে

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪১

শ্রীমতী নীলিমার করকমলে—

নীলমণি,

খুব ছোট থেকেই তুমি দেবদেবী পূজা করতে ভালবাস। কাঞ্চী হতে কুমারিকা যেখানেই যখন গিয়াছি মন্দিরে দেবদেবী দেখে তোমার কথাই মনে পড়েছে—আর তোমার উপর তাঁদের আশীর্ব্বাদ চেয়েছি। যে দিন যাই ট্রেনে তুলে দিতে এসে বলেছিলে—'মশায়, নিয়ে তো গেলেন না—ফিরে এসে গল্প করবেন'—সে অনুরোধের করুণ রেশ কানে লেগে ছিল। তাই ফিরে এসে দাক্ষিণাত্য বেড়ানর এই গল্প—যেমন পারলাম লিখে—তীর্থদেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ তোমাকে দিলাম।

তোমার দাদু

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
দাক্ষিণাত্যের পথে	...	১
মান্দ্রাজ	...	৭
পক্ষীতীর্থ	...	১৭
কাঞ্চিপুরম	...	২৫
ত্রিচিনাপল্লী	...	৩৮
শ্রীরঙ্গম	...	৪৫
জম্বুকেশ্বর	...	৪৯
তাঞ্জোর	...	৫২
মাদুরা	...	৫৮
আলাগর মন্দির	...	৮২
কাল মেঘ প্রমাড় মন্দির	...	৮৬
রামেশ্বর	...	৮৮
তিনিভেল্লী	...	৯৯
কুমারিকার পথ ও তোত্তাদ্রিনাথের মন্দির		১০১
কন্যাকুমারিকা	...	১০৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
শুচীন্দ্রম	...	১১৮
ত্রিবাঙ্কুর	...	১২২
ত্রিভেন্দ্রম	...	১২৫
জনার্দ্দিন মন্দির	...	১৩১
পদ্মনাভ মন্দির	...	১৩৬
পর্য্যটন শেষে	...	১৪৬

আভাস

দাক্ষিণাত্য ও তাহার চিত্তাকর্ষক মন্দিরাদি দেখিয়া তাহার কিছু আভাস দিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে মন্দিরগুলির ও তাহাদিগের দেবদেবীর বর্ণনা ব্যতীত অন্য যে সব কথা আছে তাহার সত্যাসত্য বা কোন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করি নাই এবং তাহা করিবার কোন আবশ্যকতাও মনে করি নাই। আমি শিল্পী নই—শিল্পীর বিশেষজ্ঞ চোখে মন্দিরগুলির স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। মন্দিরগুলি দেখিয়া মনে স্বভাবত যে ধারণা ও চিন্তা আসিয়াছে তাহাই অযোগ্য ভাষায় গ্রথিত করিয়াছি। এই পুস্তকে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণও কেহ আশা করিবেন না। ইহা ভ্রমণলিপি মাত্র। ইহা পড়িয়া দক্ষিণ-ভারতের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্পসৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি কাহার মন আকৃষ্ট হইলে ও কেহ ইহাতে আনন্দ পাইলে সুখী হইব।

আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল. ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে বেড়াইতে গিয়া যে সকল ফটোগ্রাফ লইয়াছিলেন তাহা হইতে তিনি কয়েকখানি চিত্র এই পুস্তকে মুদ্রিত করিতে দেওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

সুধা নিলয়
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
জানুয়ারী ১৯৪১

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
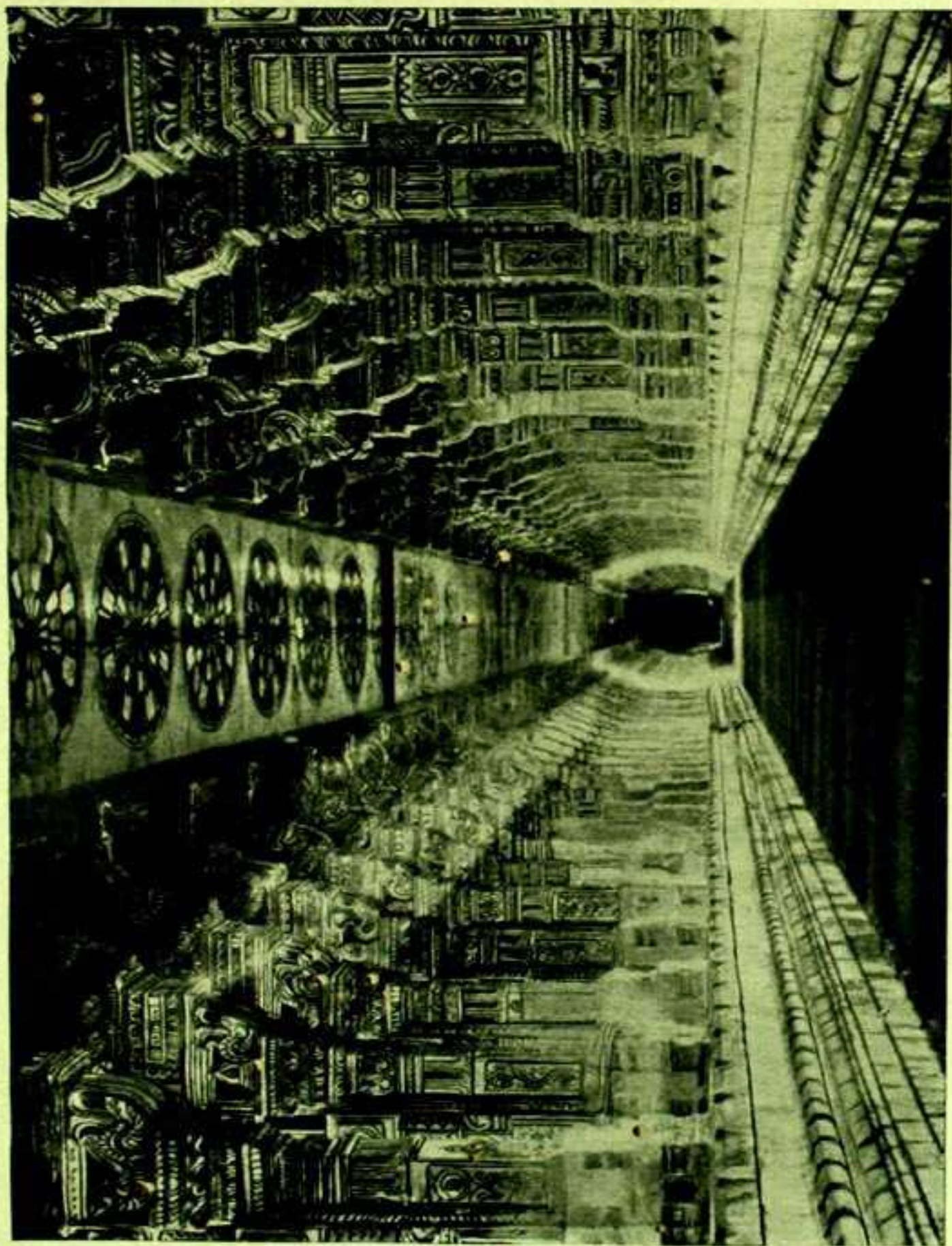
রামেশ্বর মন্দিরের সুদীর্ঘ অলিন্দ

দাক্ষিণাত্যের পথে

জীবনের এতদিন ধরিয়া বিশাল ভারতবর্ষে শুধু আর্য্যাবর্ত্তের স্থানবিশেষ মাত্র আমার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের বহু বিরাট মন্দির ও তাহাদিগের শিল্প-কারুকার্য্যাদির কথা শুনিয়া অনেকদিন হইতেই একবার দক্ষিণ ভারতে বেড়াইবার ইচ্ছা মনে জাগিতেছিল। তাহা যে হঠাৎ এমন করিয়া পূর্ণ ও সম্ভবপর হইবে তাহা ভাবি নাই। কিছুদিন আগেই শারদীয়া পূজার ছুটীতে এবারে চিত্রকূট বেড়াইয়া আসিয়াছি, বড়দিনের ছুটীতে আর কোথায়ও যাইব না—দারুণ শীতে গৃহকোণে বসিয়াই আরাম উপভোগ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যফল ও একমাত্র দেবতার আশীর্ব্বাদই যেন অন্যরূপ ঘটাইয়া আমাকে গৃহকোণ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া সুদূর দাক্ষিণাত্যের মন্দির-দ্বারে লইয়া উপস্থিত করিল। গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০, সন্ধ্যাবেলায়

এক টেলিগ্রাম পাইলাম, "আমরা কাল রামেশ্বর যাইতেছি, আপনি শীঘ্র আসুন"—আমিও অমনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। কোথায় যাইতেছি বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করায় শুধু বলিলাম, "সঙ্গ ভালো"। ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা হাওড়া হইতে মান্দ্রাজ মেলে চড়িয়া এক রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে মান্দ্রাজ যাত্রা করিলাম।

মান্দ্রাজ আসিবার পথে ট্রেনে প্রথম রাত্রির ভোরেই ঘুম ভাঙ্গতে দেখি চিল্কাহ্রদের ধার দিয়া ট্রেন ছুটিতেছে। ভোরের আলোতে চিল্কার জলরাশি ঝিকমিক করিতেছে। কয়েক মাইল ধরিয়া রম্ভা ষ্টেশনের নিকট অবধি আঁকাবাঁকা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত চিল্কার জলমধ্যে কত নৌকা কত ছোট ছোট পাহাড় বন শোভা পাইতেছে। এইখান হইতেই দীর্ঘ পথের যাত্রীর জন্য প্রকৃতি যেন তাহার সৌন্দর্য্যের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা আসিয়া দেখা দিল ও সারাপথ রেলের ধার দিয়া তাহার সু-উচ্চ লীলায়িত রূপভঙ্গিমার দিকে নয়ন আকর্ষণ করিতে লাগিল। বরাবর তালবৃক্ষের সারি প্রান্তর পূর্ণ করিয়া আছে; স্থানে স্থানে গ্রামের ছোট ছোট পাতা-ছাওয়া মাথায়-

চূড়া ঘরগুলি একসঙ্গে গায়েগায়ে লাগিয়া রহিয়াছে; সারামাঠে সতেজ নবীন ধানের ক্ষেতে প্রকৃতি দাক্ষিণাত্যের নারীর মতই একখানি উজ্জ্বল সবুজ সাড়ী পরিয়া আছে। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ এক হাজার বত্রিশ মাইল সুদীর্ঘ পথ—একমাত্র প্রকৃতির এই রূপ-সজ্জার দিকে তাকাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং গৃহের আরাম ভুলিয়া বিনাশ্রান্তিতে অতিক্রম করিয়া আসিলাম। পথমধ্যে লাংলিয়া বামছিদ্রা প্রভৃতি ছোটবড় কত নদীও পার হইলাম; ইহাদিগের মধ্যে গোদাবরীই সর্ব্বপ্রধান। গোদাবরীর উপর দেড় মাইল দীর্ঘ ব্রীজ ধীরগতিতে পার হইতে ৬ মিনিট সময় লাগিল। গোদাবরী হিন্দুর আরাধিত পবিত্র পুণ্য নদীসপ্তকের মধ্যে একটী। ইহারই তীরে রামচন্দ্র বনবাসে আসিয়া সীতাসহ পঞ্চবটী বনে বাস করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর তীরে গোদাবরী ষ্টেশনের নীচেই ব্রীজের পাশে বৃহৎ স্নানের ঘাট বাঁধান দেখিলাম—এখানেই গোদাবরী স্নানের জন্য সকল দেশের মুক্তিকামী হিন্দু নরনারী সমবেত হইয়া থাকেন। ব্রীজের উপর হইতে গোদাবরীর তীরস্থিত শুভ্র বাড়ীগুলি বেশ দেখাইতেছিল। বালুকার বড় বড় চর বক্ষে ধরিয়া গোদাবরীর সুবিস্তৃত জলস্রোত

বিভিন্ন ধারায় সবেগে পূর্ব্বদিকে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। কত নৌকা সাদা পাল তুলিয়া তাহাতে ভাসিতেছে। পুণ্য নদীর সুন্দর দৃশ্য কত আনন্দজনক! মান্দ্রাজ পৌছিবার পথে সন্ধ্যার গোধূলি-আলোকে যাহাকে অস্পষ্ট দেখিয়াছিলাম, ফিরিবার পথে প্রাতঃকালীন সূর্য্যালোকে তাহাকে দীপ্তোজ্জ্বল দেখিয়া কত শান্তি পাইলাম। শোন্ ব্রীজের পরই এই গোদাবরীর সেতু ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘ সেতু বলিয়া বিখ্যাত। ইহা বাংলার পদ্মানদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ অপেক্ষা বড় কিনা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বিখ্যাত কৃষ্ণা নদীও পার হইয়াছিলাম, কিন্তু যাওয়া আসা দুইবারেই রাত্রিতে তাহা পার হওয়ায় তাহার রূপ সন্দর্শন আর ভাগ্যে ঘটে নাই।

এই পথেই সমুদ্রকূলে হিরণ্যকশিপুর রাজধানী সীমাচলম্ ও ভিজিগাপট্টম্ প্রভৃতি স্থানেও আমাদের আর যাওয়া হয় নাই। এই সীমাচল পর্ব্বত হইতে দৈত্যপিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহার হরিভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে নীচে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—এইখানেই হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের স্ফটিক-স্তম্ভ হইতে নারায়ণের নরসিংহ-মূর্ত্তি

বাহির হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিল। ভিজিগাপটমে সমুদ্রগর্ভ হইতে তুইটী পাহাড় পাশাপাশি উঠিয়া জাহাজের নিরাপদ আশ্রয়স্থান আর কত সুন্দর দর্শন স্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। সে সকল আমাদের দেখা না হইলেও ওয়ালটেয়ার রেল ষ্টেশনে আকাশ-চুম্বী পর্ব্বতমালার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

বড়দিনের ছুটীতে মাতুরায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করিতে বহু বাঙ্গালী প্রতিনিধি আমাদিগের এই ট্রেনে যাইতে-ছিলেন। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এই ট্রেনে ছিলেন। তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য ভিজিগাপটম্-এর বাঙ্গালী অধিবাসিগণ ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে সমবেত হইয়া ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অপর্য্যাপ্ত ফুলের মালায় বিভূষিত করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহাদিগের ও ট্রেনস্থ সকলের মিলিত জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন প্রতিধ্বনিত হইল।

সারা দিনমান ও রাত্রির পর আবার সকালের দিকে মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া ট্রেন হইতে দূরস্থিত সমুদ্রের বেলাভূমি ও স্থানে স্থানে সমুদ্রের সঞ্চিত জলরাশির

দৃশ্য মনে কত উৎসাহ আনিয়া দিল। হিন্দু মহাসভার গৈরিক ধ্বজাতে সজ্জিত হইয়া এঞ্জিনের বাষ্পীয় আওয়াজে ও বাঙ্গালী প্রতিনিধিদিগের জয়ধ্বনিতে বেঙ্গল নাগপুর এবং মান্দ্রাজ ও সাউথ মারাট্টা রেলওয়ের সমুদয় বড় ষ্টেশনগুলি কম্পিত করিতে করিতে আমাদিগের ট্রেন অবশেষে মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল রেলষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ৯ টার সময় আমরা মান্দ্রাজ পৌছিলাম। স্তর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতা হইতে এই ট্রেনেই আসিতেছিলেন—তাঁহার আমন্ত্রণে মান্দ্রাজে আমরা তাঁহার বাড়ীতেই অতিথি হইলাম। হিন্দু মহাসভার বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণ মান্দ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়া উঠিলেন ও সেখান হইতে রাত্রিতেই মাদুরা চলিয়া গেলেন।

———

মান্দ্রাজ

মান্দ্রাজে ৩০নং এডওয়ার্ড ইলিয়ট রোডে স্যর রাধাকৃষ্ণণের গিরিজা-ভবনে আসিয়া আমরা স্নান সমাপনান্তে প্রথমেই মান্দ্রাজে মাইলাপুরে কপালেশ্বর শিবের মন্দির দেখিতে গেলাম। স্যর রাধাকৃষ্ণণ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এদেশে মন্দিরে যাইবার প্রথানুসারে আমরা নগ্নদেহে নগ্নপদে পট্ট উত্তরীয় মাত্র লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম ও পূজার্চ্চনা করাইলাম। কপালেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন পার্থসারথি দেবের মন্দিরেও কাল পঞ্চ-ধাতুর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন ও পূজার্চ্চনা করিলাম। এই উভয় মন্দিরসংলগ্ন দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে—তথায় স্নান করিয়াই মন্দিরে প্রবেশের নিয়ম। দক্ষিণ ভারতে আমরা এই প্রথম মন্দির দেখিলাম, ইহাদের গঠন কারুকার্য্যাদি পরে অন্যান্য যে সকল মন্দির দেখিলাম তাহাদের সকলের ন্যায় প্রায় একই ধরণের। মন্দিরগুলি চতুষ্কোণ, সম্মুখে সভামণ্ডপ ও তাহার চারিধারের

প্রাচীরে গগনস্পর্শী গোপুরম্। গোপুরম্‌গুলি মন্দিরের তোরণ বা প্রবেশদ্বার ও মন্দিরের স্থান নির্দ্দেশক চিহ্ন বলিলেই হয়। এই গোপুরম্‌গুলি বহুতলাতে ক্রমশঃ অল্প পরিসর হইয়া সহরের অন্যান্য সৌধশ্রেণী ছাড়াইয়া আকাশে উঠিয়া গিয়া জানাইয়া দেয়—এইখানে দেবমন্দির ও তাহাতে দেবতার অধিষ্ঠান। এই গোপুরম্‌গুলির গায়ে নানাপ্রকারের দেবদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি ও প্রতি তলাতে গবাক্ষ ও উঠিবার সিঁড়ি আছে। গোপুরমের সর্ব্বোচ্চ শিরে স্বর্ণমণ্ডিত কলসী স্থাপিত এবং মূল বিগ্রহের মন্দির-শীর্ষ—যাহাকে বিমান বলে—সেটীও একটী স্বর্ণমণ্ডিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট গোলক। মন্দির বিশেষে এই কারুকার্য্যের বিশিষ্টতা আছে। গোপুরম্‌গুলি অনুমান সাধারণতঃ অন্ততঃ একশত ফুট উঁচু হইবে—এই গোপুরম্ই প্রত্যেক মন্দিরের শোভা ও বিশিষ্টতা। প্রত্যেক মন্দিরেই মন্দির প্রাঙ্গণ মধ্যে অথবা পার্শ্বে একটী করিয়া টেপ্পাকুলম্ অর্থাৎ দেবতা-বিগ্রহের জলবিহারের জন্য সরোবর ও তাহার মধ্যস্থলে দ্বীপের উপর একটী করিয়া ছোট মন্দির আছে। দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে প্রথমেই একটি করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত প্রস্তরস্তম্ভ; ইহাতে দেবতার ধ্বজা উত্তোলিত হয় ও

সাধারণতঃ তাহাকে সোনার তালগাছ বলা হয়। এই ধ্বজা স্তম্ভ কোন কোন মন্দিরে শুধুই অনাবৃত কৃষ্ণপ্রস্তর স্তম্ভ। কোন কোন স্থানে অনেকগুলি বিগ্রহমন্দির ও কারুকার্য্য-সম্পন্ন সভামণ্ডপ অতিক্রম করিয়া তবে মূল দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মূল বিগ্রহ মন্দিরের সম্মুখে বিগ্রহের বাহন বৃষ কিম্বা গরুড় অবস্থান করিতেছে, নবগ্রহ ও আনুষঙ্গিক দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে—তৎপরে দীর্ঘ বেদী ও দীপাধার আছে। এই সকল সভামণ্ডপ ও আনুষঙ্গিক মন্দিরগুলির আয়তন ও শিল্পকার্য্যের বিশিষ্টতার উপরে মন্দির বিশেষের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে।

পূজার্চ্চনার উপকরণ এবং পদ্ধতি প্রায় একই প্রণালীর। একমাত্র নারিকেল ও কলা দিয়া এবং ফুল ও ফুলমালা দিয়া শুধু ঘণ্টা বাজাইয়া তীর্থযাত্রীর সাধারণ ভোগার্চ্চনা সম্পন্ন হয়। কোন মন্দিরে শঙ্খধ্বনি হইতে দেখিলাম না। মূল দেবতার মন্দিরগৃহের অভ্যন্তর সকল মন্দিরেই অন্ধকারময়—সেইস্থানে পুরোহিত তাঁহাকে নিত্য নিয়মিত-রূপে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। অন্য উপাসক বা দর্শকের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই—তাহাদিগকে দেবতার গৃহের প্রকোষ্ঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেবতার চরণে পূজা অর্পণ

করিতে হয়—আর পুরোহিতের দ্বারা দেবার্চ্চনা করাইতে হয়। মন্দিরের যে অন্ধকার গর্ভে দেবতা প্রতিষ্ঠিত সেখানে প্রদীপ ও কর্পূর জ্বালাইয়া তাঁহার যে আরতি হয় সেই আরতির আলোর সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে হয়। প্রাণে যিনি ভক্তিসাধনার প্রদীপ জ্বালিতে পারিয়াছেন ও অন্তরে সেই স্বর্ণ প্রদীপ লইয়া এই মন্দিরে প্রবেশ করেন, এই সকল মন্দিরের অন্ধকারগর্ভে একমাত্র তিনিই অধিষ্ঠাতা দেবতার সহজ সুন্দর দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। পূজার্চ্চনার সময় যে পুরোহিত পূজার্চ্চনা করেন তিনি ছাড়া আরও অন্য ব্রাহ্মণে দেবতার স্তব স্তুতি ও বেদগান করিয়া থাকেন। মন্দিরে সর্ব্বসময়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ জন্য বৃত্তি ও বেতনভোগী ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত আছেন। দেবভাষা সংস্কৃততে তাঁহাদিগের বেদগান ও মন্ত্রপাঠ অন্তরে আনন্দ আনিয়া দেয় ও মনঃপ্রাণকে ক্ষণিকের জন্যও দেবতার দিকে অগ্রসর হইবার অনুপ্রেরণা দেয়। প্রতি মন্দিরেই অর্চ্চনা ও আরতির সময় ছোট ঢাকের বাজনাসহ সুন্দর সানাই বাজিতে থাকে। অর্চ্চনান্তে পুরোহিত দেবতার প্রসাদরূপে তাঁহার বিভূতি, কুঙ্কুম, নির্ম্মাল্য ফুল, মালা, চন্দন পূজার্থীকে বিতরণ করিয়া দেন এবং দেবতার

আশীর্ব্বাদস্বরূপ একটী স্বর্ণ টোপরে দেবতার অঙ্কিত চরণযুগল যাত্রীর মস্তকে স্পর্শ করান হয়। কোন কোন্ মন্দিরে একখানি পট্টবস্ত্র দেবতার অঙ্গস্পর্শ করাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদস্বরূপ যাত্রীর মস্তকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মান্দ্রাজের কপালেশ্বরম্ শিবমন্দিরে আমরা প্রথম এইভাবে দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম এবং পরে অন্যত্র অন্যান্য মন্দিরেও এই একই প্রকার পূজাপদ্ধতি দেখিলাম। দাক্ষিণাত্যের মন্দির ও দেবতার পূজার্চ্চনা সম্বন্ধে প্রথমেই সাধারণভাবে এই স্থানে উল্লেখ করিলাম। পরে বিভিন্ন স্থানের মন্দির সম্বন্ধে আবশ্যক মত যাহা বিশেষ কথা তাহাই বলিব। এই কপালেশ্বর ও পার্থসারথিদেবের মন্দিরে স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যখন পট্টবস্ত্র পরিধানে বেদমন্ত্রগান করিতেছিলেন তখন তাহা খুব ভাল লাগিতেছিল।

এই মন্দির দেখিবার পর আমরা গৃহে ফিরিয়া যে ভাবে আহারাদি করিলাম তাহাও আমাদের বেশ ভাল লাগিল। দাক্ষিণাত্যের যে সকল স্থানে পরে গিয়াছি সে সকলস্থানেও আহারের ঐ একই নিয়মপদ্ধতি দেখিয়াছি তাই দাক্ষিণাত্যের আহার্য্য সম্বন্ধে এখানেই কিছু বলিয়া রাখিতেছি। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বাহিরে বসিবার

ড্রয়িংরুমটী পাশ্চাত্যধরণে সজ্জিত থাকিলেও ভিতরের স্বতন্ত্র মহলে রান্নাঘরের সংলগ্ন একটী বৃহৎ খাবার ঘরে গিয়া দেখি মেয়ে-পুরুষ সকলের একসঙ্গে মেজেতে কাঠের পিঁড়ি ও বড় বড় আঙ্গটকলাপাতা পাতিয়া তাহাতে প্রত্যেক পাতে দুইটী করিয়া রূপার বাটী ও রূপার গেলাসে জল দিয়া খাবার জায়গা হইয়াছে। এদেশে তামিল হিন্দুভদ্রমাত্রেই নিরামিষভোজী এবং তামার বা কাঁসার পাত্র অশুদ্ধ জ্ঞানে রূপার গেলাস বাটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গলাদেশের ন্যায় নানা ব্যঞ্জনের ও আহার্য্যের পারিপাট্য নাই, নিজেরা যাহা আহার করেন অতিথি অভ্যাগতকেও তাহাতেই তুষ্ট করেন। বাড়ীর মেয়েপুরুষ সকলে একসঙ্গে আহার করেন। ডাল ব্যতীত সব তরকারীই শুকনো করিয়া রান্না ও লঙ্কার ঝালে পরিপূর্ণ। এখানে সরিষার তেল ব্যবহার হয় না—তিল তৈলে ও নারিকেল তৈলে রান্না হয়, তাহাতে আহার্য্য কোন প্রকার বিস্বাদ হয় না। প্রায় সব জিনিষেই নারিকেল দেওয়া হয়। একটী শুধু পুরু করিয়া ডাল, একটী ধনে বা অন্য শাক দিয়া ডাল ও একটী তরকারী দিয়া টক্ ও ঝাল করিয়া রান্না ডাল, তাহার নাম সম্বর, পাঁপর, দইতরকারী অর্থাৎ

তরকারী দিয়া রান্না করা দই এবং রসম্ নামে দারুণ ঝাল দিয়া রান্না পাতলা তেঁতুলের ঝোল—এইগুলিই মধ্যাহ্ন আহারের অনিবার্য্য অঙ্গ। ইহা ব্যতীত অন্য ভাজা বা তরকারীও হইয়া থাকে। ঝাল চাট্নী, চাপাটী-রুটী, পায়সম্ ও সর্ব্বশেষে জলীয় দই দেওয়া হইয়া থাকে। চাউলগুলি সর্ব্বত্রই সুন্দর মিহি ; দুধ খাওয়ার রীতি এখানে নাই—দুধ ভাল পাওয়াও যায় না। ভাতের সঙ্গে সর্ব্বত্রই ভাল গাওয়া ঘি দেওয়া হয় এবং দু'এক প্রকার পিঠাও হইয়া থাকে। সকালবেলা চা অথবা কাফির সঙ্গে ঝাল চাট্নী দিয়া ইট্লী পিঠা উপাদেয় খাদ্য। এই আহার প্রণালী দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। আমরাও এই স্থানে প্রথম এই আহারের সহিত পরিচিত ও যে কয়দিন ছিলাম ইহাতেই অভ্যস্ত হইলাম। কাফি খাওয়া এখানে খুব চলিত এবং তাহা বেশ ভালই লাগিত। আহার করিয়া আসিবার পর পুনরায় কলা, কমলা বা অন্য ফল খাওয়া ও কাফি পান করিবার নিয়ম আছে।

আমরা আহারের পরই মান্দ্রাজ সহর দেখিতে মোটরে বাহির হইলাম। মান্দ্রাজের সমুদ্র উপকূলে মেরিণ রোডটীই বেড়াইবার একমাত্র মনোরম স্থান। এই

রোডের উপরেই মান্দ্রাজের হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি বড় বড় বিল্ডিং সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত এবং রোডের সমুদ্রকূলের ধারে বরাবর মেথিগাছের ছাঁটা বেড়া ও ফুটপাথ এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে ফুলের গাছ ও একখানি করিয়া সিমেণ্টনির্ম্মিত বসিবার স্থান আছে। মেরিন রোডে আমরা প্রথমে সামুদ্রিক মৎস্যগৃহ (aquarium) দেখিতে গেলাম। এখানে সমুদ্রের নানাপ্রকার মাছ ও সাঁপ সমুদ্রের জলপূর্ণ পৃথক পৃথক কাঁচের পাত্রমধ্যে সংগৃহীত রহিয়াছে। তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলে গ্যাস দেওয়া হইতেছে। বিভিন্ন মৎস্যগুলির গায়ের রং ও বর্ণচ্ছটা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়—কেহ নীল কেহ লাল কেহ বেগুনে কেহ বাসন্তী রংয়ের গা দোলাইয়া জলপূর্ণ কাঁচপাত্র মধ্যে খেলা করিতেছে। কাহারও কাহারও গায়ে উজ্জ্বল রংয়ের রেখাবিশিষ্ট এমন সুন্দর চিত্রাঙ্কণ যে দেখিলেই মনে হয় কোন নিপুণ শিল্পী যেন কার্পেটে রঙ্গীন সুতার মনোরম সূঁচের কাজ করিয়া রাখিয়াছে। স্বয়ং প্রকৃতির ন্যায় নিপুণ শিল্পী ও সৃষ্টিকর্ত্তা আর কে আছে? এক রকম ছোট মাছ ফুলিয়া গোলাকার

হয় বলিয়া তাহার নাম গ্লোব মৎস্য। সামুদ্রিক বাণমাছ, giant cod মাছ প্রভৃতি অনেককেই এখানে দেখিলাম। কাহারও কাণের মধ্য হইতে ডানা বাহির হইয়াছে। সিংহল হইতে একটী বৃহৎ গোসাপকেও এখানে রাখা হইয়াছে। সমুদ্রের কয়েকটী কাছিম রহিয়াছে, তাহাদের পিঠে নানা বর্ণের চিত্ররেখা ও পাগুলিতে কোন নখ নাই। এই এ্যাকোয়ারিয়াম্‌টী দেখিবার জিনিষ—ইহাতে প্রবেশ করিতে মাথা পিছু এক আনা করিয়া দিতে হইল।

এ্যাকোয়ারিয়াম দেখিয়া আমরা আডিয়ারে গেলাম। এখানে আডিয়ার নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গমের সন্নিকটে আডিয়ার নদীর উপর মান্দ্রাজের থিওজফিকাল সোসাইটী অবস্থিত। স্থানটী যেন একটী সৌন্দর্য্যের তপোবন—নানা উদ্যানে পরিবেষ্টিত ও নীরব শান্তিতে পরিপূর্ণ। এইখানে একটী বহু পুরাতন সুবিস্তৃত বটবৃক্ষ তলে মিসেস্‌ আনি বেসান্ত তাঁহার ধর্ম্ম সাধনা করিতেন ও ইহারই অদূরে সমুদ্রকূলে তাঁহার দেহকে দাহ করা হইয়াছিল।

সোসাইটীর হলগৃহের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের, বুদ্ধের, খৃষ্টের, মহম্মদের ও জোরাষ্ট্রিয়ান সাধুর মূর্ত্তি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কল্পে

সমভাবে রক্ষিত। ইহার পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত বহু পুরাতন পুঁথি ও ধর্ম্মপুস্তক সংগৃহীত। একস্থানে নানা দেশের মনীষীদিগের (রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির) স্বহস্ত লিখিত পত্র ও ধর্ম্মের বাণী ফ্রেমে বাঁধাইয়া সহজে পড়িতে পারার জন্য একটী ছোট স্তম্ভগাত্রে একত্রে লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। কত রকমের শিল্পদ্রব্য কত সুন্দর চিত্র এখানে সংগৃহীত আছে; প্রসিদ্ধ চিত্রকর Roerich এর অঙ্কিত দেবদূত চিত্রখানি হলের মহিমা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আডিয়ারের রাস্তায় সমুদ্র উপকূলে রাজা অন্নামলাই চেট্টির প্রাসাদ দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। আমরা পুনরায় মেরিন রোড দিয়া সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বাড়ী ফিরিলাম এবং দু'একখানি সিল্ক সাড়ীর দোকান দেখিয়া রাত্রিতে মান্দ্রাজেই বিশ্রাম করিলাম।

পক্ষীতীর্থ

২৭শে ডিসেম্বর সকালে আমরা মান্দ্রাজ হইতে ৩৫ মাইল দূরে চিংলিপুট জেলার সদর স্থান চিংলিপুট সহর ও তথা হইতে ৭ মাইল দূরে তীরুকালুকুণ্ডরম্ নামক স্থানে পক্ষীতীর্থ দেখিতে মোটরে যাত্রা করিলাম। চিংলিপুট যাইবার রাস্তার ধার দিয়া স্থানে স্থানে নারিকেল বৃক্ষের সারি বড় অভিনব লাগিল এবং বরাবর রাস্তার ধারে ছোট ছোট পাহাড় ও হ্রদের সমাবেশ বড় ভাল লাগিল। বেলা সাড়ে দশটার সময় তীরুকালু-কুণ্ডরমে পৌছিলাম। এখানে একটি খাড়া উঁচু পাহাড়ের উপর বেদ্রিগিশ্বর মহাদেবের মন্দির। পাহাড়টিতে উঠিবার সিঁড়ি আছে এবং উঠিবার জন্য ডুলি পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের উপরে মন্দিরে উঠিবার পূর্ব্বে পাহাড়ের পাদদেশে উচ্চ গোপুরম্‌বিশিষ্ট আরও দুইটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং একটি বৃহৎ কালীমুর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা পাহাড়ের উপর বেদ্রিগিশ্বর শিবের মন্দিরে

২—O. P. 59

উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ডুলি করিয়া প্রায় পাঁচশত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পর্ব্বতশীর্ষে মন্দির দ্বারে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে সমুদ্রকূল অবধি সব দেখিতে পাওয়া গেলেও মন্দির অভ্যন্তরে প্রকৃতির এই মুক্ত স্থানে দারুণ অন্ধকার-মধ্যে বেদ্রিগিশ্বর শিবলিঙ্গ, তাঁহার প্রকোষ্ঠের নিকট সুন্দর একটি নটরাজমূর্ত্তি এবং আর এক দিকে কালীমূর্ত্তি নির্জ্জনে বিরাজ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে মন্দিরের দু'একটি গবাক্ষ দ্বারা অল্প পরিমাণ আলো ও বাতাস আসিতেছে।

আমাদিগের দর্শন ও পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া মন্দির হইতে একটু নামিয়া দেখিলাম ঐ পাহাড়ের উপরেই আর একটি স্থানে অনেক লোক বসিয়া স্থানটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। আমরাও সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইহাই বিখ্যাত পক্ষীতীর্থের স্থান। এখানে প্রতিদিন বেলা ঠিক সাড়ে এগারটার সময় চিলের ন্যায় বড় দুইটি সাদা পাখী আসিয়া তাহাদিগকে যে ভোগ দেওয়া হয় তাহা ভোজন করে। একজন পুরোহিত পূর্ব্ব হইতে পাখীর জন্য খিচুড়ি ও পায়স ভোগ রাঁধিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখেন। প্রবাদ এই যে এই পাখী দুটি শাপভ্রষ্ট ঋষি। ইহারা
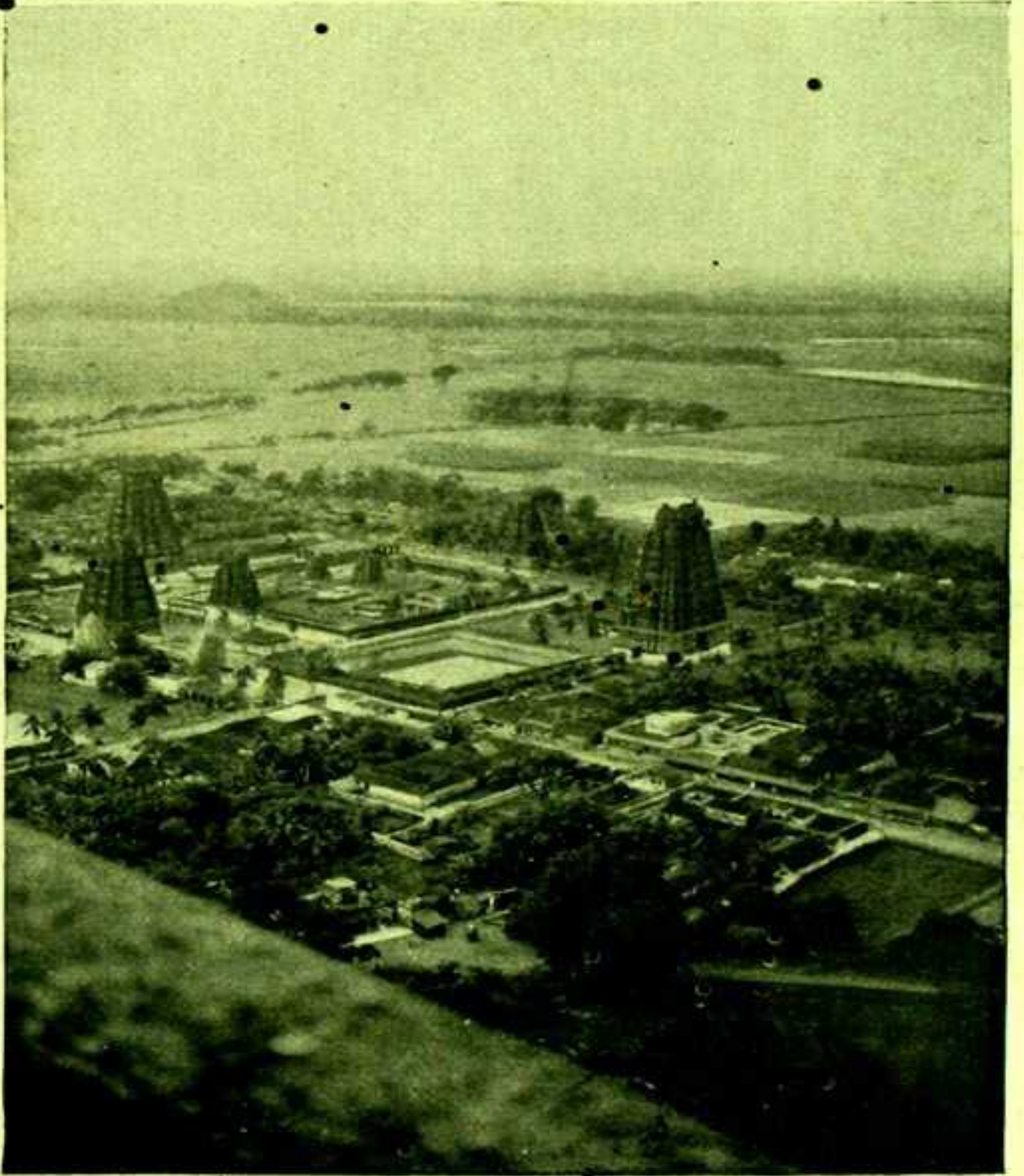
পক্ষীতীর্থের পর্ব্বত হইতে নিম্নে মন্দির গোপুরমাদির দৃশ্য

(১৮ পৃষ্ঠা)

প্রতিদিন, কেহ বলেন মানস সরোবর হইতে—কেহ বলেন কাশী হইতে স্নান করিয়া রামেশ্বর গিয়া সেখানে রামেশ্বর নাথ শিবকে দর্শন করিয়া এই স্থানে আসিয়া ভোজন করে এবং এখান হইতে চিত্রকূট গিয়া শয়ন করে। এই ইহাদের দৈনিক কার্য্য। এই পাখীর পূজা ও ভোগ হইতেই এই স্থানের নাম পক্ষীতীর্থ। এই পাখীর ভোজন দেখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বহুলোক জমিয়াছে—আর সকলেই নিজ নিজ নানান ভাষায় কথা বলায় একটা মিশ্রিত কলরব উত্থিত হইতেছে। পুরোহিত খাবার ঠিক রাখিয়া যে স্থানে বসিয়া আছেন সেখান হইতে সম্মুখে দশ বার মাইল দূর সমুদ্রকূল অবধি দৃষ্টি চলিতেছে। বামদিকে আরও অন্য পাহাড় রহিয়াছে। পাখী ঐ সমুদ্রের দিক হইতে আসিবে বলিয়া কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া সকলেই ঐ সমুদ্রকূলের দিকে আকাশ পানে উৎসুকনয়নে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটি, পরক্ষণেই আর একটি প্রায় দেড়ফুট উঁচু দুটি সাদা চিল পাখী ঐ পাহাড়ের উপর আসিয়া বসিল। তাহারা যেন কত পথশ্রান্ত এই রকম তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। পুরোহিত

আগেই ছুটি রূপার বাটীতে ভোগ রাখিয়া দিয়াছেন এবং কিছু ভোগ হাতে করিয়া পাখীর দিকে হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছেন। এই স্থানে পাহাড়ে একটি ঝরণা আছে। শুনিলাম পাখীরা তাহাতে স্নান করে। একটি পাত্রে তেল ও একটি পাত্রে জল রাখা হয় পাখীদের স্নানের জন্য। পাখীরা তেলের পাত্রে মাথা ডুবাইয়া লইয়া পরে স্নান করে। আমরা দুর্ভাগ্যবশত পাখীর স্নান করা দেখিতে পাইলাম না। পাখীরা বিনা স্নানেই পাহাড়ে আসিয়া বসিবার একটু পরেই দু'তিন মিনিট বিশ্রাম লইয়াই আহারের পাত্রের নিকট আসিল ও তাহাতে খাইতে আরম্ভ করিল। পাখী দুইটির মধ্যে একটি একটু ছোট, হয়ত সেটি স্ত্রী পক্ষী সে পুরোহিতের হাত হইতেও খাইল। সে বড়টীর খাবারের পাত্রে মুখ দিতে যাওয়ায়—বড় পাখীটি তাহাকে ঠুকরাইয়া সরাইয়া দিল। শাপ-ভ্রষ্ট ঋষি হইলেও তাহারা জাতীয় হিংসা ছাড়ে নাই দেখিলাম। ভোজনান্তে অল্প সময় মধ্যে পাখী দুটি আবার উড়িয়া শীঘ্রই আকাশে অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকের মনের বিস্ময় তখন বাড়িয়া গেল। ইহারা কি সত্যই শাপ-

পক্ষীতীর্থে পক্ষীর ভোজন
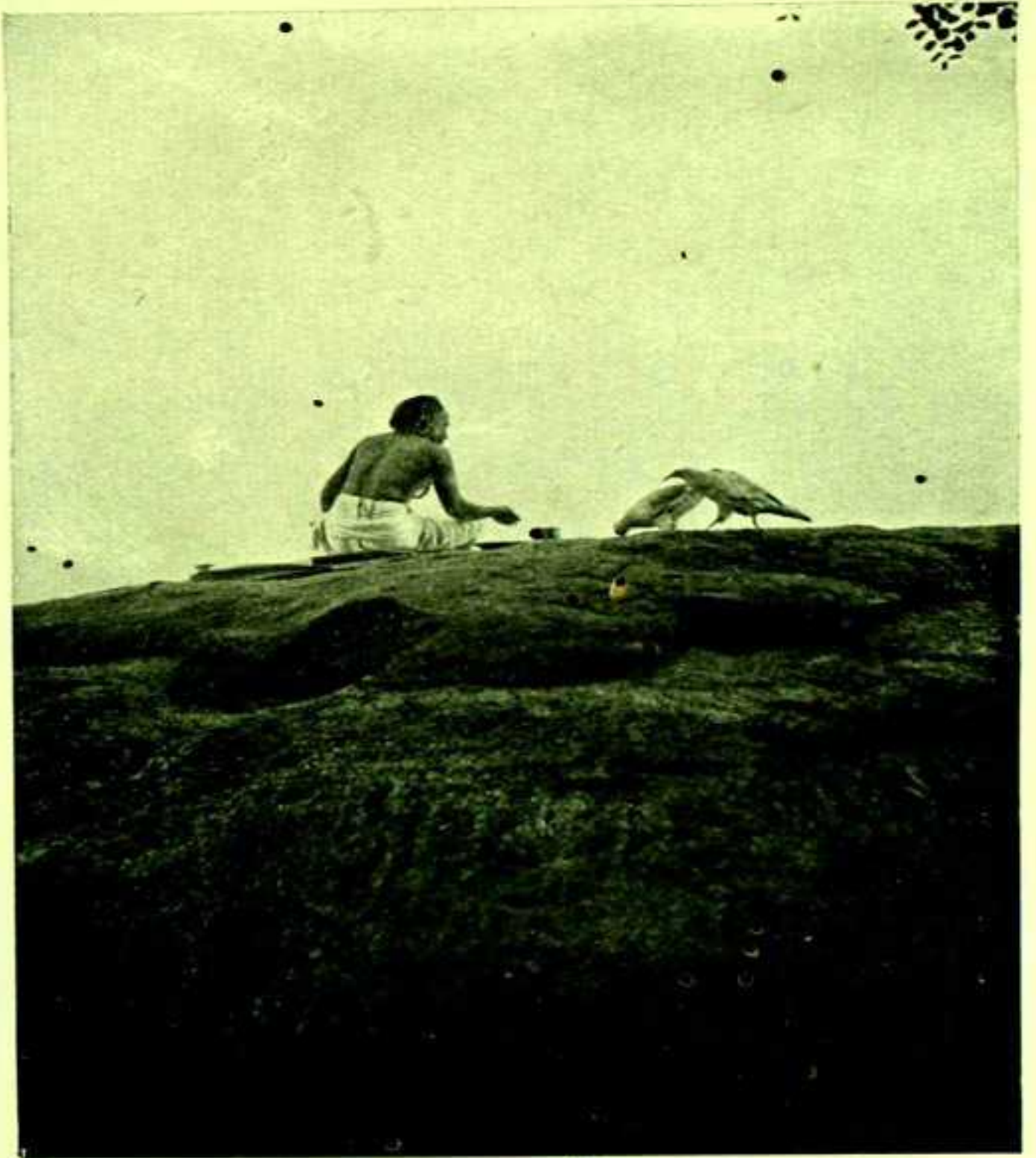
(২০ পৃষ্ঠা)

ভ্রষ্ট ঋষি কিম্বা কোন রকম বন্যপাখী এখানকার এই পাহাড়ের কোন গহ্বরে থাকে—খাবারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অভ্যাস মত আসিয়া উপস্থিত হয় ও খাইয়া চলিয়া যায়? অথবা ইহাদের এই নিত্য নিয়মিত আবির্ভাবের মধ্যে অন্য কোন রহস্য নিহিত আছে? অনেকের মনেই একটা অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার চঞ্চলতা দেখা দিল। সে যাহা হউক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এদেশে ঐই রকমের পাখীর অভাব নাই, আমরা পথে এই রকমের পাখী আরও দেখিলাম, কিন্তু বহু পুরাকাল হইতে ঐ রকমের দুটিমাত্র পাখী ঠিক ঐ একই মধ্যাহ্ন সময়ে প্রতিদিন এই একই স্থানে আসিয়া আহার করিয়া যায় ও তাহারা অন্যত্র হইতে উড়িয়া আসে—প্রথমত নীলাকাশে সাদা বিন্দুর মত দেখা যাইতে যাইতে ক্রমশঃ বড় হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই পাহাড়ে আসিয়া বসে। একথা এখানকার পুরাতন ইতিবৃত্তে এমন কি Dutchদিগের সময়কার কাগজ-পত্রেও লিখিত আছে। বিশ্বে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা আমাদের দর্শনশাস্ত্রের স্বপ্নেরও অগোচর—কাজেই নাস্তিকতার তর্ক মধ্যে বিশেষ কোনও আলোক প্রাপ্তির

আশা না দেখিয়া তীরুকালুকুণ্ডরম্ পাহাড়ের উপর উন্মুক্ত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা দেবতার চরণে প্রণতি জানাইয়া আমরা নামিয়া আসিলাম। নামিবার সময় দেখিলাম পুরোহিত ঐ পাখীর প্রসাদ সমবেত যাত্রীদিগকে বিতরণ করিতে-ছেন। যাত্রীবিশেষের নিকট পাখীর ভোগ দিতে হইবে বলিয়া পুরোহিত ২॥০ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত যথাসম্ভব অর্থ লইয়া থাকেন। আমরা পক্ষীর ভোগ দেওয়ার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করায় পুরোহিত আমাদিগকে প্রায় এক ঘটি পায়স প্রসাদ দিয়াছিলেন। এখানে বেদ্রিগিশ্বরের মন্দিরের একটি কুণ্ড-পুকুর-পাহাড়ের নীচে আছে—তাহার জলে হাঁপানী ও অন্য রোগ সারে।

পক্ষীতীর্থ হইতে আমরা চিংলিপুটে ফিরিয়া সেখানকার জেলাজজ শ্রীযুক্ত রামস্বামী আয়ারের বাড়ীতে অতিথি হই ও সেখানেই আহারাদি করি। তাঁহার বাংলোখানি একটি অল্প উচু পাহাড়ের উপর বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। স্থানটির চারিদিকে অনেক-গুলি পাহাড় এবং তাহার পাদদেশে অনেক দূর লইয়া হ্রদ শোভা পাইতেছে। এই স্থানে Dutchদিগের

দুর্গ ছিল। ক্লাইভের সহিত এখানেই ফরাসী সেনা-নায়ক লরেন্সের যুদ্ধ হয়। বাংলোখানির সংলগ্ন উদ্যান তাহার নির্জ্জন-শ্রী ও শীতল বাতাস আমাদিগের পথশ্রান্তি দূর করিয়া দিল—সর্ব্বোপরি জজদম্পতির ভদ্র ব্যবহার ও সমাদর আমাদিগকে মুগ্ধ করিল।

পক্ষীতীর্থ হইতে আর বারো চৌদ্দ মাইল গেলেই সমুদ্র-কূলে বলিরাজার পুরী মহাবলীপুরমে যাওয়া যাইত। মহাবলীপুরমে পাণ্ডবেরা আসিয়াছিলেন। এখানে সমুদ্রকূলে পাণ্ডবদিগের নামে রথাকারে সাতটি বৃহৎ মন্দির বা প্যাগোডা এক-একটি এক-এক খণ্ড পাহাড় হইতে কাটিয়া প্রস্তুত করা আছে। তাহার স্থাপত্যশিল্প দেখিবার জিনিষ। শুনিলাম প্যাগোডাগুলির মধ্যে ৬টি সমুদ্রে ভাঙ্গিয়া গিয়া এখন ১টি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমাদিগের সময় সংক্ষেপ জন্য আমরা তথায় যাইতে পারিলাম না। ঐ দিনই আহারান্তে আমরা কাঞ্জীভরমে চলিয়া গেলাম। চিলিংপুট হইতে আমরা মোটরে বাইশ মাইল আসিয়া বেলা ৩টার সময় কাঞ্জীভরমে পৌছিলাম। এই বাইশ মাইল পথ বরাবর পালার নদীর ধার দিয়া গিয়াছে। রাস্তাটি বৃক্ষছায়ায় শীতল এবং পথের

দৃশ্যও খুব সুন্দর। পালার নদীর তীরে শিবরাম-নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটি শিব মন্দির দেখিতে পাইলাম।

কাঞ্চিপুরম্

কাঞ্চি কাশীর ন্যায় ভারতবর্ষের একটি বহু পুরাতন পুণ্যতীর্থ, পুরাকালে দক্ষিণভারতে হিন্দুর সাধন ভজন শাস্ত্রাধ্যয়ন বিদ্যানুশীলন ও প্রাচীন সভ্যতার প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। হিমালয়-শীর্ষে বদরীনারায়ণকে উত্তর কাশী এবং কাঞ্চীকে দক্ষিণ কাশী বলা হইয়া থাকে। কাশী কাঞ্চীর নাম চিরদিন একত্রে গ্রথিত। কাঁঞ্চি অর্থে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সহর। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে কাঞ্চণ অর্থে স্বর্ণ, সেই কাঞ্চনপুরম্ হইতে হয়ত কাঞ্চিপুরম্ নাম হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ভাষার প্রভাবে এই কাঞ্চিপুরমের অপভ্রংশ হইয়া ইহাকে কাঞ্জীভরম্ বলা হয়। সে যাহা হউক এই পুরাতন তীর্থস্থানটি শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটির মধ্যে প্রায় তিন মাইল ব্যবধান। এই দুই স্থানে শৈব ও বৈষ্ণব সাধনার সংস্কৃতি এবং দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এইখানকার মন্দিরের

যে কারুকার্য্য তাহাই দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত স্থাপত্যশিল্প। এই কারুকার্য্যের আদর্শ যত দক্ষিণে গিয়াছে তত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মাদুরার মন্দিরে ইহার রূপান্তর বুঝিতে পারা যায়, অবশেষে রামেশ্বর গিয়া এই আদর্শের যে কতটা হ্রাস হইয়াছে তাহাও প্রতীয়মান হয়। কাঞ্চি শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ দুই মহাপুরুষের সাধনক্ষেত্র ও তাঁহাদিগের বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ-মত প্রচারের প্রধান স্থান।

আমরা প্রথমে বিষ্ণুকাঞ্চি দেখিয়া—পরে শিবকাঞ্চি যাইতে দেখিলাম কাঞ্চির সেই পুরাকালের রাস্তা কয়েকটি, যাহা আজিও সমভাবে রহিয়াছে, তাহা কত প্রশস্ত ও কি সুন্দর সরল রেখায় অবস্থিত। কতকাল পূর্ব্বে এই প্রাচীন সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলিও প্রস্তুত হইয়াছিল। এই রাস্তাগুলি হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহর পরিকল্পনার ও শিল্প-নৈপুণ্যের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। চীন পর্য্যটক হিউয়েন স্যাং তাঁহার ভ্রমণ-লিপিতে এই কাঞ্চি সহর ও ইহার রাস্তাগুলির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষ্ণুকাঞ্চির প্রধান মন্দিরে বরদরাজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং তাঁহার পার্শ্বে মহালক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। বৃহৎ

গোপুরম্ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। গোপুরম্‌টী যেমন উচ্চ তেমনি কারুকার্য্যে পূর্ণ। মন্দিরের প্রাঙ্গণও খুব প্রশস্ত। প্রাঙ্গণ মধ্যে দেবতার জল বিহারের সরোবর ও তাহার গর্ভে দেবতার বিহার মন্দির। এই সরোবরের সম্মুখেই একশত প্রস্তরস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সভামণ্ডপ। প্রত্যেক স্তম্ভটি এক খণ্ড পাথর হইতে প্রস্তুত উঁচুতে প্রায় কুড়ি ফুট হইবে এবং প্রত্যেক স্তম্ভে ঐ একই পাথর হইতে একটি করিয়া মূর্ত্তি খোদিত আছে। ঐ স্তম্ভের উপর মণ্ডপের যে ছাদ তাহার কোণগুলিতে একখণ্ড পাথর হইতে একত্রে প্রস্তুত করা পাথরের শিকল সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি ও লতাপুষ্পাদি কারুকার্য্য রহিয়াছে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে একখণ্ড প্রস্তর হইতে একটি কূর্ম্মের উপর বৃহৎ শতদল খোদিত একটি পদ্মাসন দেখিতে পাইলাম, উৎসব সময়ে দেবতার ভোগমূর্ত্তিকে আনিয়া তাহাতে বসান হয়। এই শতস্তম্ভ মণ্ডপটি ১৬০০ শত খৃষ্টাব্দে বিজয়-নগর রাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত হইয়া পরে এই মন্দির মধ্যে যোগ করা হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিক পাথরে বাঁধান। শতস্তম্ভ মণ্ডপের পর আর একটি বৃহৎ মণ্ডপ রহিয়াছে তাহার স্তম্ভ গাত্রে এক-এক খণ্ড প্রস্তর হইতে খোদিত

বৃহৎ অশ্বারোহীর মূর্ত্তিসকল শোভা পাইতেছে। এই মণ্ডপটি ভাস্কর্য্যের একটি বিরাট পরিকল্পনা। উৎসবাদি সময়ে ইহাতে সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হইতে পারে। এই মণ্ডপ সম্মুখে হোমকুণ্ড ও তাহার উপর চারিটি স্তম্ভ যুক্ত একটি কারুকার্য্যময় ছোট মণ্ডপ, তাহার পর স্বর্ণময় ধ্বজাস্তম্ভ। এই বৃহৎ মণ্ডপের পর বরদরাজ দেবের উচ্চ মন্দির। আমরা অনেকগুলি সিঁড়ি উঠিয়া এই বরদরাজ মূর্ত্তির মন্দির সম্মুখে আসিলাম ও তাঁহার দর্শন অর্চ্চনা করিলাম। মন্দির দ্বারে তাম্র নির্ম্মিত দুইটি সুবৃহৎ দ্বারপাল রহিয়াছে। বরদরাজদেব কণ্ঠে শালগ্রাম শিলার মালা— বক্ষে লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং চারিহস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম—মস্তকে মণিময় কিরীট লইয়া সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তিতে শোভা পাইতেছেন। কর্পূর আরতির আলোকে তাঁহার মূর্ত্তি আরও মধুর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সাতশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে বিষ্ণুর দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে বরদরাজ দেবের বর্ত্তমান প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার ঐ দারুময় মূর্ত্তি মন্দিরের সরোবর জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। দুই বৎসর পূর্ব্বে ঐ সরোবরের জল ছাঁকিয়া উহার পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় ঐ দারু মূর্ত্তি তুলিয়া দেখা গেল এই

সাত শত বৎসর ধরিয়া উহা জলমধ্যে ঠিক রহিয়াছে—উহার কোনরূপ বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন হয় নাই। জলমধ্য হইতে তুলিবার পর উহার যে ফটোগ্রাফ চিত্র লওয়া হইয়াছে তাহাও আমরা দেখিলাম। সরোবরের পঙ্কোদ্ধারের পর পুনরায় ঐ মূর্ত্তিকে সরোবরের জলমধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সরোবরের সংস্কার-কার্য্যে চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই মন্দিরে যে সব যাত্রী আসিয়াছে গত দুই বৎসরে প্রত্যেকের নিকট হইতে দুই আনা করিয়া আদায় করিয়া ঐ চৌদ্দ হাজার টাকা উঠিয়া গিয়াছে—ইহাতেই বুঝা যায় এই মন্দিরে প্রতিদিন কত যাত্রী আসিয়া থাকে। বরদরাজ মন্দিরের পশ্চাৎভাগে একটি দীর্ঘ প্রকোষ্ঠ আছে—এই প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণবপ্রবর রামানুজ তাঁহার গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে রামানুজের গুরু ও অন্যান্য মনীষী সাধুদিগের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই মন্দির হইতে কুড়ি মাইল দূরে শ্রীপেরুম্বুদর্ নামক স্থানে রামানুজের জন্ম। রামানুজ এই বরদরাজ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের অনুপ্রেরণা পান এবং এই মন্দিরে সাধনা করিয়া ও এই স্থানে তাঁহার মত প্রচার করিয়া কাঞ্চির গৌরব

বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বরদরাজ দেবের এই মূর্ত্তির সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বরদরাজ দেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি কূয়া আছে তাহা এই মন্দির যতদিনের ততদিনের পুরাতন—পুরোহিত ব্যতীত অন্য কেহ এই কূয়ার জল স্পর্শ করিতে পায় না। বরদরাজ মন্দিরের পাশেই মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির—মহালক্ষ্মীর সুন্দর মূর্ত্তির সম্মুখে ভোগ উৎসবের স্থান—তাহার পার্শ্বে বিগ্রহ-দিগের মণিমাণিক্য রাখিবার ঘর। ইহার পর একটি গহ্বরে নরসিংহদেব মূর্ত্তি রহিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের মন্দির ও দেবতা সম্বন্ধে একটি কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। প্রত্যেক মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত মূল দেবতা বিগ্রহের একটি করিয়া ভোগমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহারও যথারীতি ভোগপূজা হইয়া থাকে। মূল বিগ্রহকে তাঁহার স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা যায় না এবং তাহা কখন করাও হয় না। তাঁহার ভোগমূর্ত্তিকেই শয়নকালে শয়ন মন্দিরে অথবা উৎসবকালে সভা মণ্ডপাদিতে লইয়া যাওয়া হয়। এই ভোগমূর্ত্তি প্রায়ই ধাতুনির্ম্মিত এবং মূল মূর্ত্তির সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। উৎসবের সময় এই ভোগ-মূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করা হয়—

তাহার জন্য মন্দিরে বহুমূল্য আসবাবপত্র থাকে। দেবতার বাহন গরুড়, হংস, হস্তী, ঘোটক প্রভৃতির মূর্ত্তি এবং নানারূপ সিংহাসন ছত্র প্রভৃতি মন্দির মধ্যে রক্ষিত হয়। এই মন্দিরে উৎসব সময়ে ভোগমূর্ত্তি বহিয়া লইবার জন্য স্বর্ণ-মণ্ডিত গরুড়, রৌপ্যমণ্ডিত হংস, কাষ্ঠ নির্ম্মিত বড় বড় হাতী ঘোড়া, স্বর্ণমণ্ডিত সহস্রফণার সর্প দেখিতে পাইলাম। দেবতার মস্তকে ধরিবার একটি ছত্র দেখিলাম ২০।২২ ফুট লইয়া তাহার পরিধি এবং পরিসর। এই ছত্র তলে ভোগ-মূর্ত্তিকে বাহনের উপর বসাইয়া তাহা লোকে বহিয়া লইয়া যায়। এই মন্দিরে ব্রহ্ম উৎসব বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসে হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কুমার তাতাচারী বর্ত্তমানে বিষ্ণুকাঞ্চির মন্দিরের ট্রাষ্টি। তিনিই আমাদিগকে বিষ্ণুকাঞ্চির মন্দিরগুলি দেখাইলেন ও সব বুঝাইয়া দিলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চি হইতে শিবকাঞ্চি যাইতে পথে একখানি প্রকাণ্ড শোভমান রথ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—জানিলাম ঐ রথখানি কামাক্ষীআম্মল দেবীর উৎসব রথ। অতঃপর আমরা শিবকাঞ্চিতে রাজরাজেশ্বরী কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম। প্রথমে

কামাক্ষীআম্মলের ভোগমূর্ত্তির সম্মুখে তাঁহার আরতি দেখিলাম। বহুপ্রদীপবিশিষ্ট দু'তিন প্রকারের পিতলের ঝাড়, চামর, পাখা প্রভৃতি লইয়া শানাই ও ছোট ঢাকের বাজনার সহিত কামাক্ষী দেবীর মহিমান্বিত আরতি হইল। ইহার মূল মূর্ত্তিটি বড় অভিনব। রাজরাজেশ্বরী কামাক্ষী বামহস্তে রৌপ্যনির্ম্মিত একখানি ইক্ষুদণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তে একটি বীণা বাজাইতেছেন—দেখিতে খুবই অপরূপ। জানিনা এই মূর্ত্তিতে শাস্ত্রের কোন গূঢ় ব্যাপার প্রকটিত কিনা!

এই কামাক্ষী দেবীর মন্দিরেই জ্ঞানের অবতার শঙ্করাচার্য্যের দেহ রক্ষা হয়। তাঁহার দেহরক্ষার স্থান সম্বন্ধে অন্য ভিন্ন মত থাকিলেও যে কাঞ্চি তাঁহার সাধনার স্থান ছিল সেখানেই তাঁহার দেহরক্ষা ও সমাধি স্থান থাকিবার অধিক সম্ভাবনা। যাই হোক এই কামাক্ষী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণের একাংশে একটি ক্ষুদ্র গৃহে আমরা মহামানব শঙ্করাচার্য্যের সমাধির উপর তাঁহার একটি প্রস্তর মূর্তি দেখিয়া ধন্য হইলাম। এই সমাধি গৃহের উপর একটি গৈরিক পতাকা উড়িতেছে এবং শঙ্কর মূর্ত্তির পাদদেশে কয়েকটি দণ্ডীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শঙ্কর মূর্ত্তির

পরিধানে গৈরিক বসন কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ কর্ণে লৌহবলয় ললাট চন্দনচর্চ্চিত হস্তে দণ্ড—দেখিলেই সে অদ্বৈতবাদের অবতারের পদে ভক্তিতে মস্তক নত হইয়া আসে। জীবন যাঁহার মহাসন্ন্যাসব্রতে উৎসর্গীকৃত এই আড়ম্বর শূন্য নির্জ্জন সমাধি তাঁহারই উপযুক্ত। কুম্ভকরমের শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ইন্দ্র সরস্বতী মহাশয় এই সমাধির উপর শঙ্কর মূর্ত্তির শিরে একটি সমুজ্জ্বল রৌপ্যছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই মূর্ত্তির চরণে আমাদিগের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিয়া শিবকাঞ্চির আম্রেশ্বর শিব মন্দিরে গেলাম।

আম্রেশ্বর মন্দিরটি চারিদিকে উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি বৃহৎ গোপুরম্ অঙ্গে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি লইয়া মস্তকে পিতলের মঙ্গল কলসী লইয়া উর্দ্ধে গগন স্পর্শ করিয়া আছে ও দূর হইতে তীর্থ-যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। গোপুরম্ পার হইয়া সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ মধ্যে বিরাট সভামণ্ডপ নানামূর্ত্তিসমন্বিত কারুকার্য্যময় প্রস্তর স্তম্ভের উপর অবস্থিত। এই মণ্ডপ পার হইয়া আম্রেশ্বর দেবতার মন্দির, তাহার সম্মুখে বৃহৎ ধ্বজাস্তম্ভ। মন্দির-দেওয়ালে

শিবের কামধ্বংস করিবার মূর্ত্তি খোদিত। মন্দিরে শিবের বালুকা নির্ম্মিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে জলাভিষেক করিবার নিয়ম নাই। শুধু পুষ্প বিল্বপত্রে ইহার অর্চ্চনা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি আমগাছ আছে। এই আম্রবৃক্ষ তলে প্রলয়কালে ভগবান বালির লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলেন—সেই বালির লিঙ্গই আম্রেশ্বর শিব। এই আমগাছে এক-এক শাখায় অম্ল মিষ্ট কটু তিক্ত চারি রকমের আম হয়—ইহাকে চতুর্ব্বর্গ ফল বলা হয়। গাছটি বহু পুরাতন বলিয়া কথিত—এখনও সতেজ আছে দেখিলাম। কিন্তু শুনিলাম এখন আর বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রকম ফল ধরে না। মন্দিরের একাংশে ১০৮টি শিবলিঙ্গযুক্ত একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। ষড়ানন, নটরাজ প্রভৃতি প্রস্তরের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সুন্দর ভঙ্গিতে বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে যে কামাক্ষী দেবী দেখিয়া আসিলাম ঐ কামাক্ষী দেবীই পার্ব্বতী। পার্ব্বতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য শিব আম্রেশ্বর এখানকার পম্পা নদীর জলে সব ভাসাইয়া দেন। পার্ব্বতী তখন সব ভুলিয়া শিবকে আলিঙ্গন করেন। পার্ব্বতী শিবলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন—লিঙ্গশীর্ষে সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে—স্বর্ণে প্রস্তুত পার্ব্বতীর ও

সর্পফণার এই মূর্ত্তিটিকে স্বর্ণকবচ বলা হয়। প্রতি সোমবারে আম্রেশ্বর এই স্বর্ণকবচ নিজ অঙ্গে পরিয়া থাকেন। পার্ব্বতী ভয়চকিত হইয়া শিবলিঙ্গকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন—লিঙ্গোপরি সর্প ফণাবিস্তার করিয়া আছে—বালির লিঙ্গে কবচের এই স্বর্ণমূর্ত্তির আলিঙ্গন দেখিয়া বড় আনন্দ হইল, দেখিতে বড় ভাল লাগিল।

এই মন্দিরে চৈত্রমাসে শিবের বিবাহ উৎসব হয়। সেই উৎসবের জন্য মন্দিরের অপরাংশে এক সহস্র স্তম্ভের আরেকটি সভামণ্ডপ আছে। এই সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপের উপরে কল্যাণ মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত। এই কল্যাণ মণ্ডপে আম্রেশ্বরের ভোগমূর্ত্তির সহিত কামাক্ষী দেবীর ভোগমূর্ত্তির বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই মণ্ডপে যাইতে পম্পা সরোবর নামে একটি পুকুর আছে।

আম্রেশ্বর মন্দির হইতে কিছুদূরে শিবকাঞ্চিতে আমরা বামন অবতারের একটি মন্দির দেখিলাম। সমুদ্র কূলে মহাবলীপুরমে দানশীল বলিরাজা বাস করিতেন। ইন্দ্রের স্বর্গের প্রতিযোগিতায় তাঁহার রাজধানী মহাবলীপুরম গঠিত হইয়াছিল। বলিরাজার প্রভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন কাঁপিয়া যাইত। তাঁহার দানের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিবার জন্য

ভগবান বামনরূপে বলিরাজার নিকটে আসিয়া ত্রিপাদ মাত্র ভূমি দান ভিক্ষা চাহেন। বামনের তিন পা ভূমি আর কতটুকু হইবে ভাবিয়া ভগবানের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া বলিরাজা বামনকে তিন পায়ের পরিমাণ ভূমি দান করিতে গিয়া দেখিলেন বামনের দুখানি পায়েই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের সকল স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, তৃতীয় পা রাখিবার আর স্থান নাই। তখন বলির দানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। বলি অনুতপ্ত অন্তঃকরণে বামনের শরণাগত হইয়া বামনের চরণ তলে মাথা পাতিয়া দিলেন বামন বলির মাথায় তাঁহার তৃতীয় পদ রক্ষা করিলেন। বলির সহিত ভগবানের এই লীলা প্রদর্শন করিয়া বামন অবতারের একটি বৃহৎ বিরাট মূর্ত্তি এখানে আছে। মন্দির মধ্যে বলিরাজার মস্তকে একখানি পা রাখিয়া বামনদেব দাঁড়াইয়া আছেন।

টি. আর. গোপাল বলিয়া এলোর কলেজের একটি ছাত্র ও এখানকার অধিবাসী আমাদিগকে আম্রেশ্বর শিবমন্দির ও বামনাবতারের মন্দির দেখাইয়াছিলেন। কাঞ্চিপুরম দক্ষিণ-ভারতে বস্ত্রবয়নশিল্পের একটি প্রধান ও বিখ্যাত স্থান। উত্তরভারতে বাংলার ঢাকাতে যেমন মসলিন্ প্রস্তুত হইত ও এখনও বিখ্যাত শাড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে, দাক্ষিণাত্যে

এখানেও তেমনি রেশমের নানা রকম সুন্দর বস্ত্র বহুকাল হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সিল্ক শাড়ি ও বস্ত্রাদির জন্য কাঞ্চিপুরম বিখ্যাত। মন্দির দর্শনের পর আমরা এখানকার একটিসিল্ক কাপড়ের দোকানে গিয়া অনেক রকমের সাড়ি কাপড় দেখিলাম। রাত্রি ৮টাতে পুনরায় চিংলিপুট ফিরিয়া তথা হইতে রাত্রি ১১টার ট্রেণে ত্রিচিনাপল্লী যাত্রা করিলাম।

ত্রিচিনাপল্লী

একবালে তিনটি মাথাবিশিষ্ট এক অসুর এইস্থানে ছিল বলিয়া ইহার নাম ত্রিচিনাপল্লী। ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে আমরা এখানে আসিয়া পৌছিলাম। এখানকার রেলষ্টেশনটি রামেশ্বর ধনুষ্কোটী যাইবার জংসন ষ্টেশন ও খুব বড়। ষ্টেশনে আসিবার পূর্ব্বেই 'গোল্ডেন রকে'র সন্নিকটে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের বৃহৎ কারখানা বহুদূর লইয়া উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া ট্রেণ হইতে একটি কেল্লার মত দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার এবং ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার পথটি মাটির নীচে গভীর করিয়া কাটিয়া প্রস্তুত জন্য ষ্টেশনটিও একটি দুর্গ বিশেষ। ষ্টেশন হইতে দূরে এখানকার উকীল আর, শ্রীনিবাস আঁয়ার মহাশয়ের বাটীতে আমরা অতিথি হইলাম। তিনি আমাদিগের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই ছুটিতে বম্বে চলিয়া যান, তাঁহার ভ্রাতা এবং ভাইপো আমাদের তত্বাবধান করেন। তাঁহাদিগের নিকটেও আমরা যথেষ্ট ভদ্রব্যবহার

পাইলাম। তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইয়া আমরা এখানকার দ্রষ্টব্য Rock fort Temple এ গেলাম।

ত্রিচিনাপল্লীর পর্ব্বতগাত্রে একটি সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া পর্ব্বত উপরে এই মন্দির প্রস্তুত—পর্ব্বতটি তাহার উচ্চ শিরে এই মন্দির লইয়া একটি সুরক্ষিত দুর্গের মত দাঁড়াইয়া আছে ও কত সুন্দর দেখাইতেছে। পর্ব্বতের তলাতেই পাহাড় কাটিয়া একটি বড় ঘর, সেখানে মন্দিরের একটি ছোট হাতী বাঁধা রহিয়াছে—সেইস্থান হইতেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়িটিও এমন ভাবে প্রস্তুত যে খানিকটা উঠিয়া বিশ্রাম করা যায়। তাহার জন্য মাঝে মাঝে পাহাড়টিকে পরিসর করিয়া কাটিয়া ছাদ করিয়া তাহাতে দাঁড়াইবার স্থান ও তাহার সম্মুখে দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত এবং পাহাড়ের গায়ে দেওয়ালে পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত আছে। ৫০টি সিঁড়ি উঠিবার পরই পাহাড় কাটিয়া একশত স্তম্ভের একটি মণ্ডপ প্রস্তুত দেখা যায়। ১১০ সিঁড়ি উঠিবার পরই একটি চাঁদনী প্রস্তুত আছে—সেখানে পাহাড়ের দেওয়াল গায়ে শিব-পার্ব্বতী কি করিয়া একটি নারীর প্রসবকালে তাহাকে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন চিত্রে তাহা দেখান আছে।

ঐই কাহিনীটী পরে বলিব। এই চিত্রাঙ্কন আবার মন্দিরের উপরে উঠিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪০ সিঁড়ি উঠিবার পর একটি জানালা দিয়া সহরটির দৃশ্য পাওয়া যায়। পর্ব্বতগাত্রে এই সিঁড়িটি ঘরের ভিতরকার সিঁড়ির ন্যায় আগাগোড়া ছাদ দিয়া ঢাকা। মূল মন্দিরের অনেক নীচে ১৮৫ সিঁড়ি উঠিবার পর একটি লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং ২১৬ সিঁড়ি উঠিবার পর দুর্গাদেবী ও কার্ত্তিকের মূর্ত্তি ছোট ছোট মন্দির মধ্যে স্থাপিত। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যাত্রীরা উপরে মূল মন্দিরে গমন করে। এইরূপে ৩৬০টি সিঁড়ি উঠিয়া আমরা রক্‌ফোর্ট বা পর্ব্বত-দুর্গ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরে একদিকে মথুরভূতেশ্বরং শিব এবং আর একদিকে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শিবমন্দিরের সম্মুখে রৌপ্য-মণ্ডিত বৃহৎ বৃষমূর্ত্তি। এই মন্দিরের সংলগ্ন দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে নটরাজের মূর্ত্তি এবং হরপার্ব্বতী সম্বন্ধীয় বহু পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। গর্ভবতী রমণীকে হরপার্ব্বতীর শুশ্রূষা করার কাহিনীটিও চিত্রে বর্ণনা করা আছে। কাহিনীটি বড় করুণ এবং মধুর। রত্নাবতী বলিয়া একটি চেটীবালিকা গর্ভাবস্থায় তাহার শ্বশুর গৃহে একাকী বাস করিতেছিল। তাহার মা এইস্থানে

কাবেরী নদীর অপর পারে থাকিত। তাহার প্রসব বেদনা উঠিলে সে তাহার মাকে তাহার নিকট আসিবার জন্য সংবাদ দেয়। মা কন্যার প্রসববেদনার সংবাদ পাইয়াই কন্যার কাছে যাইবার জন্য বাহির হয়—কিন্তু কাবেরী নদীর কূলে আসিতেই ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ও নদীতে বন্যা আসায় দুর্য্যোগের মধ্যে সে কাবেরী পার হইতে না পারিয়া অপরপারেই থাকিয়া যায়। এদিকে তাহার কন্যা প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং একাকী বিপদাপন্ন হইয়া ভগবানের নিকট তাহার মাতার উপস্থিতির জন্য অন্তরের করুণ প্রার্থনা জানায়। এই স্থানের সর্ব্বদুঃখহর শিব মথুরভূতেশ্বরং চেটীবালিকার করুণ প্রার্থনায় স্থির থাকিতে না পারিয়া চেটী বালিকা রত্নাবলীর মাতার রূপ গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া রত্নাবলীর নিকট উপস্থিত হন এবং রত্নাবলীর প্রসব সময়ে তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে বিপদমুক্ত করেন। মহাদেব হর এইরূপে চলিয়া আসিবার পর ঝড় বৃষ্টি থামিলে রত্নাবলীর মা তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় ও কন্যার সংবাদ জানিতে চায়। রত্নাবলী তাহাতে অবাক হইয়া মা তাহার সহিত ছলনা করিতেছে বলে।

কিন্তু মা সত্যই দুর্য্যোগের জন্য কাবেরী পার হইয়া আসিতে পারে নাই জানিয়া তখন সে বুঝিতে পারিল এ আর কেহ নহেন স্বয়ং মথুরভূতেশ্বরং মহাদেব তাহার মাতার রূপ লইয়া আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন। দেবতার সেই করুণাস্পর্শে তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে।

মথুরভূতেশ্বরের মন্দির মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। এই মন্দিরে দেবতার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁ দিকে জানালা দিয়া উত্তর দিকে কাবেরী নদী ও তাহার কূলস্থিত বনরাজির সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরে পূজার্চ্চনার পর আমরা পার্ব্বতীর মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিলাম। পার্ব্বতীর মন্দিরটি আগাগোড়া দেবদেবীর মূর্ত্তি লইয়া নানা কারুকার্য্যে সুশোভিত। এই মন্দিরে পার্ব্বতীর নাম দেবীসুগন্ধিকুন্তলা। মুল মন্দিরের মধ্যে আশে পাশে আরও অনেক দেবতা প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির হইতে আরও উর্দ্ধে পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি স্থাপিত। সেখানে সর্ব্বশেষে উঠিতে হয়। সেখানে উঠিতে পর্ব্বতশীর্ষে একটি গম্বুজের মধ্যে একটি সুবৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান রহিয়াছে। তাহা বাজাইয়া সিদ্ধিদাতার মন্দিরে গিয়া আমরা তাঁহার বিশালকায় মূর্ত্তির
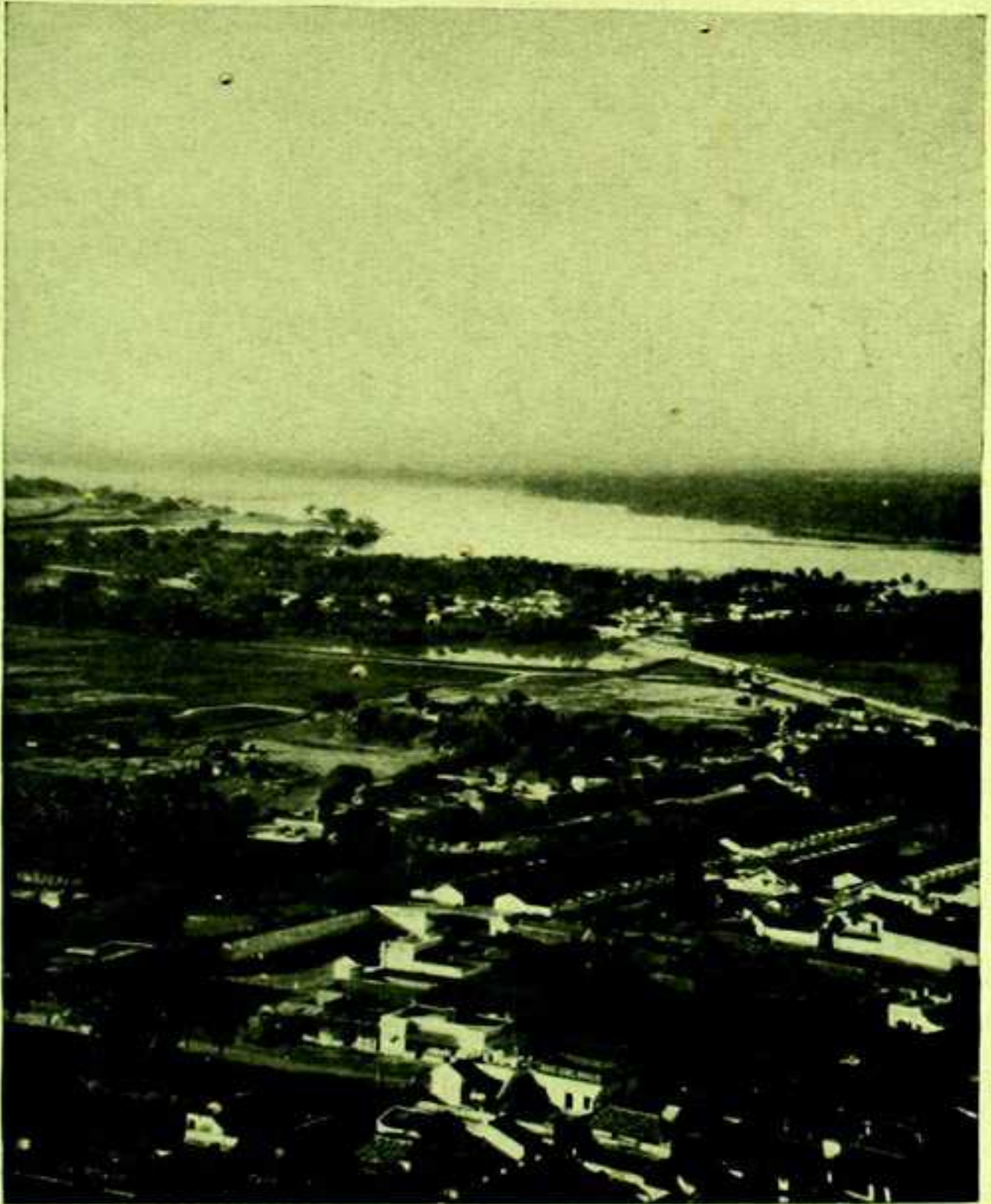
রকফোর্ট মন্দির হইতে কাবেরী নদী ও ত্রিচিনাপল্লীর দৃশ্য

(৪৩ পৃষ্ঠা)

সম্মুখে পূজার্চ্চনা শেষ করিলাম। সিদ্ধিদাতার মন্দিরে উঠিবার পথটী খাড়া উঁচু, পার্শ্বে লৌহ রেলিং দ্বারা রক্ষিত হইলেও রোমাঞ্চকর। পর্ব্বতশীর্ষে এই স্থান হইতে চারিধারের দৃশ্যটি এই রকফোর্ট মন্দিরের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। শিব-পার্ব্বতী এবং গণেশ এই তিন মন্দিরের চূড়া পাহাড়ের মস্তক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে সমুদয় ত্রিচিনাপল্লী সহরটি তাহার ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ীঘরের মধ্যে সরলরেখার রাস্তাগুলি—পর্ব্বতের পাদদেশে মন্দিরের পুকুরটি, দূরে golden rock পাহাড়, বহু গির্জ্জার চূড়া, বাজার দোকান, রেলষ্টেশন সৌধ, দূরের পল্লী সবই এই পর্ব্বতশীর্ষ হইতে বহু নীচে একখানি সুন্দর ছবির মত চোখের উপর ভাসিতে থাকে। অপর দিকে কাবেরী নদী তাহার বক্ষে রেলের ও সাধারণ রাস্তার দুটি সেতু তাহার পর বহু বনাকীর্ণ প্রান্তর মধ্য হইতে দূরে দূরে দুইদিকে শ্রীরঙ্গম ও জম্বুকেশ্বর মন্দিরের উচ্চ গোপুরম্ অন্যরূপ দৃশ্যপটের সৃষ্টি করে।

উপর হইতে নামিয়া এই মন্দিরে উঠিবার সময় নীচে দুয়ারে যে একটি ছোট হাতী দেখিয়াছিলাম তাহাকে পূজার নারিকেল প্রসাদটি খাইতে দেওয়ায় সে তাহা পায়ের

তলায় চাপিয়া তাহার মালা ভাঙ্গিয়া শুঁড় দিয়া শাঁসগুলি ছাড়াইয়া কেমন খাইল দেখিয়া অবাক হইলাম।

পর্ব্বতদুর্গমন্দির দেখিয়া মোটরে কাবেরী নদীর উপর দিয়া আমরা শ্রীরঙ্গম দেখিতে গেলাম। যাইতে কাবেরীর অপর পারে "আম্মামণ্ডপ" ঘাটে নামিয়া কাবেরীর পূজার্চ্চনা করিলাম। প্রশস্ত প্রস্তর বাঁধান ঘাটে তাহার উপরে চাঁদনী নিৰ্ম্মিত আছে—চাঁদনীশীর্ষে বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তামিল ভাষায় 'আম্মা' অর্থে মা—এই আম্মাঘাটে স্নান এবং শ্রাদ্ধাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। ঘাটে অনেক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা এবং যাত্রীর সমাবেশ দেখিলাম। হিন্দুর পুণ্যপূত নদীগুলির মধ্যে কাবেরীও অন্যতম। সেই কাবেরীকে এখানে দর্শন করিয়া তাহাতে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধন্য হইলাম। পুণ্যতোয়া কাবেরী বিশাল বক্ষে খরতর স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। কি সুন্দর তাহার দৃশ্য—কি শীতল সুস্বাদু তাহার জল—কেন তাহাতে স্নান করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ হইল—আমরা স্নান পূর্ব্বেই সারিয়া লইয়াছিলাম। কাবেরীকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন ও স্পর্শ করিবার পর এই ঘাটের সম্মুখস্থ সোজা সুপ্রশস্ত পথ দিয়া আমরা শীঘ্রই শ্রীরঙ্গম মন্দিরে গিয়া পৌঁছিলাম।

শ্রীরঙ্গম

শ্রীরঙ্গম কাবেরী নদীর দুই শাখার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভগবানের রঙ্গভূমি রূপেই অবস্থিত। আমরা যেখানে কাবেরীর পূজার্চ্চনা করিলাম সেইস্থানে শ্রীরঙ্গমের দক্ষিণ দিয়া কাবেরী বর্ত্তমানে প্রবাহিতা। শ্রীরঙ্গমের উত্তরে তাহার আর একটি শাখা এখন স্রোতহীন। শ্রীরঙ্গম মন্দিরের ব্যাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়াই মনে হইল এবং মন্দিরটি সুরক্ষিত বিশাল দুর্গস্বরূপ পরপর সাতটি উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরটির চারিদিকের পরিধি অন্যূন একমাইল হইবে। এই প্রথম প্রাচীরের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিদিকে চারিটি উচ্চ গোপুরম্ তোরণদ্বার আছে। প্রথম প্রাচীরের পর দ্বিতীয় প্রাচীরের বেষ্টনী—তাহাতেও চারটি গোপুরম্ গগন স্পর্শ করিতেছে। এইরূপে পরপর সাতটী প্রাচীরের বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া তবে শ্রীরঙ্গনাথের গর্ভমন্দির। প্রত্যেক প্রাচীরের পর মন্দির পরিক্রমপথ এবং তাহার দুইপার্শ্বে

দোকান পাট বাজার হাট বসতবাটী প্রভৃতি সবই এই দুর্গমধ্যে। সাতটি প্রাচীর মধ্যে যেন দুর্গের সাতটি মহাল। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রাচীরে দুইটি করিয়া গোপুরম—চতুর্থ মহালে গিয়া মূল মন্দিরের গোপুরম্ তোরণদ্বার এবং মন্দির আরম্ভ। এই চতুর্থ প্রাকারের পূর্ব্বদিকের গোপুরম্‌টী প্রায় দেড়শত ফুট উঁচু হইবে। চারিদিকের প্রাকারগুলিতে সর্ব্বসমেত একুশটি গোপুরম আছে। গোপুরম্‌গুলি সবই গগনস্পর্শী এবং তাহাদের গঠনসৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য ঊর্দ্ধে আকাশে চাহিয়া দেখিতে হয় ও দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। না দেখিলে তাহাদের বিরাটত্বের কোন ধারণা হয় না। মন্দিরের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। পাথরে যে এমন রূপ ফুটাইয়া তুলা যায় তাহা পূর্ব্বে দেখি নাই। সু-উচ্চ তোরণদ্বার—তাহার পর অঙ্গন, তাহার পর মন্দিরের কারুকার্য্যমণ্ডিত স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত প্রকোষ্ঠ, শতস্তম্ভ ও সহস্রস্তম্ভযুক্ত বিভিন্ন মণ্ডপ—মন্দির গাত্রে দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি—সম্মুখে ভক্তিভরে সুবৃহৎ গরুড় দাঁড়াইয়া আছে—সোনার তালগাছ বা ধ্বজাস্তম্ভ ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে, সর্ব্বশেষে চারিবেদের প্রতীক স্বরূপ চারিটি সুবর্ণ কলসী মস্তকে ধরিয়া মন্দিরের স্বর্ণোজ্জ্বল বিমান ঊর্দ্ধে

শোভা পাইতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরঙ্গনাথ অনন্ত শয্যায় শেষনাগের উপর শুইয়া আছেন—মস্তকে শেষ সর্প তাহার পাঁচটি ফণা বিস্তার করিয়া আছে। কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হস্তে বিশাল সুন্দর বিষ্ণু মূর্ত্তি বহু মূল্যের হীরা পান্না ও স্বর্ণাভরণে সজ্জিত। নীচে সম্মুখে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, ভূমিমূর্ত্তি ও শ্রীমূর্ত্তি সহ শ্রীরঙ্গনাথের সোনার ভোগমূর্ত্তি রহিয়াছে। উৎসবের সময়ে এই সকল ভোগ-মূর্ত্তিকে লইয়া শোভা যাত্রাদি করা হয়। উৎসবের সময়ে শ্রীরঙ্গনাথকে দু'কোটী টাকার অধিক গহনা পরাইয়া দেওয়া হয়। এই বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তির সম্মুখে পূজার্চ্চনার সময় কর্পূর আরতির আলোকে তাঁহাকে দর্শন করিলাম ও তখন বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামে আসিয়াছি মনে হইল—আপনার জন যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহাদিগকে এই শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথকে দেখাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইল।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের মণ্ডপের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রস্তর খোদিত বৃহৎ অশ্বারোহী মূর্ত্তি মুক্ত অসি হস্তে আরূঢ় অশ্বের গতি সংযত করিতেছে এই কারুকার্য্যের শিল্পী ভাস্করের কি অসাধারণ প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান; তিনি এই সকল প্রস্তর মূর্ত্তিতে কি সুন্দর ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইহার কারুকার্য্য ও শিল্প দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। শতস্তম্ভ মণ্ডপের সমুদয় স্তম্ভগুলি এক-একখানি প্রস্তর হইতে অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্ত্তিসহ নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার উপর কারুকার্য্যমণ্ডিত মণ্ডপের ছাদ শোভা পাইতেছে। এই মণ্ডপে ও সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপে উৎসব মেলাদি হইয়া থাকে। মূল মন্দিরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মন্দির অনেক রহিয়াছে। বৈষ্ণবপ্রবর ভক্ত রামানুজের মূর্ত্তিও এই বিষ্ণুমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। আমরা যখন শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আমাদিগের সামান্য ভক্তি নিবেদনপূর্ব্বক ঘুরিয়া দর্শন করিতেছিলাম তখন ঢাক ও সানায়ের মধুর বাজনা আমাদের এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে যাইবার পথ সুখকর করিয়া তুলিতেছিল। একটি সুসজ্জিত হস্তী আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছিল এবং আমরা চলিয়া আসিবার সময় একটি বৃহদাকার হস্তী তাহার প্রকাণ্ড দীর্ঘ দুইটী দাঁত লইয়া হুঙ্কারে তাহার সম্মুখের পা দুইটি উঁচুতে তুলিয়া পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া শুঁড় বাঁকাইয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিল। আমরা শ্রীরঙ্গনাথকে শেষ প্রণাম জানাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমরা জম্বুকেশ্বরের মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

জম্বুকেশ্বর

জম্বুকেশ্বর শিবমন্দির কাবেরীর উত্তর পারে শ্রীরঙ্গম্ হইতে প্রায় দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মন্দির মধ্যে একটি পুরাতন জামগাছের তলায় এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং এই জামগাছ হইতেই ইহার নাম জম্বুকেশ্বর। জাম গাছটি দেবতার মন্দির সংলগ্ন হইয়া মন্দির বাহিরে মন্দিরের উপর শাখা বিস্তার করিয়া আছে; দেখিলে বোঝা যায় এই জামগাছটি রক্ষা করিয়া উহার সান্নিধ্যে লিঙ্গ দেবতার মন্দির পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দির মধ্যে যেস্থানে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত সেখানে লিঙ্গ দেবতার আসনের নিম্নে একটি ঝরণা হইতে কাবেরীর জল নিয়ত উত্থিত হইতেছে। জলের এই উৎসটি এস্থানে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়, নহিলে ঐরূপ জল উঠিবার স্থানেই বা দেবগৃহ নির্ম্মিত হইবে কেন। জম্বুকেশ্বর শিব পূর্ব্বে যেস্থানে ছিলেন ঠিক সেই স্থানেই এই মন্দির নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যে এই উৎসের জল ক্রমান্বয় ছেঁচিয়া ফেলিতে হয়, নহিলে গৃহ

৪—O. P. 59

জলপূর্ণ হইয়া যায়। বিশ্ব বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা—কতদূর হইতে পুণ্যতোয়া কাবেরীর জল আপনা আপনি এই শিব লিঙ্গের আসন তলে উত্থিত হইয়া উৎসরূপে অঞ্জলি প্রদান করিতেছে, লিঙ্গ দেবতা তাহাতে তৃপ্ত হইতেছেন। আমরা মন্দির গৃহে এই জলের উপর দাঁড়াইয়া দেবতার পূজার্চ্চনা সম্পন্ন করিলাম।

জম্বুকেশ্বর মন্দিরটিও পরপর চারিটি প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রথম প্রাকারের প্রাঙ্গণেই একটি সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ বিদ্যমান—মণ্ডপের প্রত্যেকটি স্তম্ভ কারুকার্য্যময়—দেবদেবীর ও হস্তী ঘোটকাদির মূর্ত্তি সমন্বিত। দ্বিতীয় প্রাকারে দুইটি গোপুরম্ এখান হইতে আর একটি গোপুরম্ মধ্য দিয়া তৃতীয় মহলে পৌঁছিতে হয়—বলা বাহুল্য গোপুরম্গুলি সর্ব্বত্রই একই প্রকারের কারুকার্য্যময় ও গগনস্পর্শী উচ্চ। তৃতীয় প্রাকারের প্রাঙ্গণ মধ্যে দুইটি কারুকার্য্যময় স্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপ আছে—উৎসব সময়ে এই মণ্ডপ দু'টিতে ভোগমূর্ত্তি আনয়ন করা হয় ও এইস্থানে গীত বাদ্যাদি হয়। এই তৃতীয় প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া চতুর্থ মহলে সুউচ্চ প্রস্তর প্রাচীর মধ্যে প্রথমেই যে জম্বুকেশ্বর মন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহাই অবস্থিত, এই স্থানেই জম্বু

বৃক্ষ ও কাবেরী নদীর উৎস। জম্বুকেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে অখিলেশ্বরীর মন্দির। সেখানে সোনার কানবালা পরিয়া সুন্দর পার্ব্বতী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। মূর্ত্তির সম্মুখস্থ মণ্ডপের স্তম্ভে হস্তীর ও দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। একটি স্তম্ভগাত্রে শিব তাঁহার দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে লইয়া ত্রিমূর্ত্তি হইয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহার পার্শ্বে হংস গরুড় বৃষ এই বাহনগণ খোদিত রহিয়াছে। এই মন্দির সম্মুখে সিদ্ধিদাতা গণেশ রহিয়াছেন—এই সকল মন্দিরে প্রস্তরশিল্পের নিদর্শন এক এক স্থানে এক এক রকম—আমরা সময় সংক্ষেপ জন্য তাড়াতাড়িতে যাহা দেখিয়াছি তাহার সূক্ষ্ম বর্ণনা সম্ভব না হওয়ায় মোটামুটি যাহা মনে আছে তাহাই বলিয়া গেলাম। অতঃপর আমরা ত্রিচিনাপল্লীতে ফিরিয়া আহারান্তে ত্রিচিনাপল্লী হইতে ৩৫ মাইল দূরে মোটর করিয়া তাঞ্জোর দেখিতে গেলাম ও সেখানে অপরাহ্ণ ৪টায় গিয়া পৌছিলাম।

তাঞ্জোর

তাঞ্জোর মারহাট্টাদিগের একটি প্রসিদ্ধ রাজধানী। এইস্থান এখনও মারহাট্টা অধিবাসীতে পূর্ণ। এখানে আসিয়া আমরা তাঞ্জোরের যে রাজপ্রাসাদ দেখিলাম তাহা ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিজয়রাঘব নায়েক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মহারাষ্ট্র নগর ও ইহার লুপ্তশ্রী রাজপ্রাসাদ দেখিয়া মহারাষ্ট্রদিগের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া দুঃখে বলিতে হয়—সব কি ছিল আর কি হইয়াছে! প্রাসাদের দুদিকে দুটি বহুতলবিশিষ্ট বিপুল Tower বা গোপুরম দণ্ডায়মান। একটি হইতে দূরে কোন শত্রু আসিতেছে কি না লক্ষ্য করা হইত, অপরটির শীর্ষ হইতে মহারাষ্ট্রীয় রাজা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ৩৫ মাইল দূরে ত্রিচিনাপল্লীতে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু মন্দির দর্শন করিতেন। তাঞ্জোরের শিবাজি এখানকার শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাষ্ট্রীয় রাজা। তাঁহার দরবার গৃহ আমরা দেখিলাম। তাহার স্তম্ভগুলি দেওয়ালের চিত্রগুলি হল-গৃহের ছাতের তলদেশ সবই মনোরম। এই

হলে সাহাজি, তুকাজি, সরফোজি, শিবাজি প্রভৃতি অনেক গুলি মহারাষ্ট্রীয় রাজার চিত্র রহিয়াছে—জানিনা পরলোক হইতে তাঁহাদিগের আত্মা তাঁহাদিগের এই বাসস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইতেছে কিনা। শেষ রাজা শিবাজির স্বর্ণসিংহাসনখানি এই দরবার গৃহেই ছিল—শুনিলাম তাহা ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছে।

এখানকার রাজপ্রাসাদে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতে সংস্কৃত তামিল প্রভৃতি ভাষার হস্তলিখিত বহু পুরাতন পুঁথি সংগৃহীত আছে। বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তক এইস্থানে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থাগারের রক্ষিত পুঁথি সমূহের একটি মুদ্রিত তালিকা পুস্তক আছে তাহার মূল্য তিন টাকা। পণ্ডিত আর, রঙ্গচারিয়া এই গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ অতি বিনয় সহকারে আমাদিগকে এই গ্রন্থাগার দেখাইলেন।

রাজা বিজয়রাঘব নায়েক কর্ত্তৃক তাঞ্জোর সহর মধ্যে একটি উচ্চ স্থানে একটি বৃহৎ কামান রক্ষিত হইয়াছিল। উহা আজও তথায় রহিয়াছে—যদিও তাহার পাদদেশের স্থানটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কামানটি ২২ফুট লম্বা ও পঞ্চলৌহ নির্ম্মিত জন্য অদ্যাপি তাহাতে কোন মরিচা ধরে

নাই। মহারাষ্ট্র রাজাদিগের সময়ে যে শিবগঙ্গা পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করা হইত ঐ পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। এই সকল দেখিয়া আমরা তাঞ্জোরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখানকার মন্দির দেবতা শিবের নাম বৃকোদেশ্বর। শিবলিঙ্গটির আয়তন বিপুল জন্য আমরা মন্দিরের পুরোহিতকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলাম দেবতার নাম বৃহৎ ঈশ্বর অথবা বৃকোদরেশ্বর কি না—কিন্তু উত্তরে বৃকোদেশ্বর বলিয়াই শুনিতে পাইলাম। তাঞ্জোরে এই একই মন্দির। উহা একটি দুর্গ মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত গভীর গড়খাই পরিখা কাটা রহিয়াছে। পরিখার কোন কোনটিতে জলও রহিয়াছে। চারিদিকে পরিখার উপর দিয়া উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর। আমরা শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের যে সপ্ত প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির দেখিলাম সেওতো একটি বিশাল দুর্গস্বরূপ। এখানকার এই মন্দির বহু প্রাকার-বেষ্টিত না হইলেও এই মহারাষ্ট্রীয় নগরে যে নরপতি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনি সামরিক প্রথায় ইহাকে বহিঃশত্রু হইতে সুরক্ষিত করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ৯০০ শত বৎসর

পূর্ব্বে এক চোল রাজা কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাঁহার মূর্ত্তি এই মন্দির মধ্যে রক্ষিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের সকল মন্দিরেই গোপুরমগুলি দেবতার মন্দিরশীর্ষ বিমান হইতে উচ্চ। কিন্তু এখানকার মন্দিরের এই বিশেষত্ব দেখিলাম যে অন্যান্য স্থানের ঐ উচ্চ গোপুরমের আকারেই মূল মন্দিরের চূড়া নির্ম্মিত হইয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে এবং মূল মন্দিরটি তাহার বহির্গাত্রে নানা কারুকার্য্য ও দেবদেবীর মূর্ত্তি লইয়া গগনস্পর্শ করিতেছে। দূর হইতে সুমহান জমকাল দৃশ্য! মন্দিরে যাইতে প্রথমেই একটি ঊর্দ্ধ গোপুরম পার হইয়া একটি প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় গোপুরমে আসিতে হয়। এই গোপুরমে প্রস্তর খোদিত বৃহৎ শিশুপাল মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। এখান হইতে মন্দির অভ্যন্তরের বৃহৎ প্রস্তর বাঁধান প্রাঙ্গণ আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রাঙ্গণ মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত বৃকোদেশ্বর শিবের মন্দির। প্রাঙ্গণে মন্দির সম্মুখে পাথরের একটি উচ্চ পাদপীঠের উপর মন্দির দেবতার বাহন প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণকায় বৃষ পা মুড়িয়া বসিয়া আছে। এই অসাধারণ বৃষটি বসিয়াই ১০।১২ ফুট উঁচু হইবে এবং সেই পরিমাণে ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ।

এক খণ্ড কাল গ্রেনাইট প্রস্তর হইতে ইহা খোদিত। ইহার দেহ ও পায়ের গঠনে এবং চক্ষুর চাউনিতে ইহাকে জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। বৃষটি উহার নির্ম্মাতার অসাধারণ দক্ষতা ও শিল্প নিপুণতার পরিচয় দিতেছে। যে পাদপীঠে ইহা বসিয়া আছে তাহার উপর একটা স্তম্ভযুক্ত ছাত রহিয়াছে এবং চারিদিকে লোহার রেলিং ঘেরা আছে। যেমন দেবতা তাঁহার তেমনই বাহন। সম্মুখেই মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন তিনিও একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তর হইতে বিশাল বিপুল আয়তনে নির্ম্মিত। এই লিঙ্গ মূর্ত্তিটি এতই স্থুল ও উচ্চ যে গৃহমধ্যে ইহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ মঞ্চ গাঁথা আছে তাহার উপর উঠিয়া আরতি ও প্রদক্ষিণ করিতে হয়। মন্দিরটি এই দেবতারই অনুরূপ ও উপযুক্ত। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল গোপুরম দেখিয়াছি—তাঞ্জোরের এই শিব মন্দির তাহার দ্বিগুণ উঁচু হইবে। মন্দির গায়ে শিল্প কার্য্যও অতুলনীয়। ইহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তি ব্যতীত চোল ও নায়েক মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের মূর্ত্তি সকল নির্ম্মিত আছে। মন্দিরের চারিদিকে ছাতবিশিষ্ট বারান্দা রহিয়াছে। এই মন্দিরের একটি বিশেষ নির্ম্মাণ কৌশল এই যে ইহার গগনস্পর্শী চূড়ার ছায়া কখন ভূতলে মাটিতে পতিত হয় না।

যদি Cyprus দ্বীপে কলোসাসের মূর্ত্তি পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, জানিনা তাঞ্জোরের এই সুমহান মন্দির ইহার বিরাট দেবতা ও তাহার বিশাল বাহন বৃষভরাজ জগতের আশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? মন্দির প্রাঙ্গণ মধ্যে পার্ব্বতী মন্দিরে পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি বড় মধুর লাগিল। পার্ব্বতীকে মহারাষ্ট্রীয় নারীর ধরণে সবুজ রংএর শাড়ি পরান রহিয়াছে—তাহা বড় সুশ্রী লাগিতেছে। পার্ব্বতীমন্দিরে আমরা পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া তাঞ্জোর হইতে পুনরায় ত্রিচিনাপল্লী ফিরিলাম ও তথা হইতে রাত্রি ১১টার ট্রেনে উঠিয়া রাত্রি ৩টার সময় মাতুরাতে পৌঁছিলাম।

———

CENTRAL LIBRARY

মাত্বরা

দাক্ষিণাত্যের নগরগুলির মধ্যে মাত্বরা শ্রেষ্ঠত্বে দ্বিতীয় নগর হইলেও মাত্বরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের জন্যই তাহার গৌরবখ্যাতি। মাত্বরার মন্দির ভারতবর্ষের স্থাপত্য শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করি। এই মন্দিরটি দেখিয়া মনে যে তৃপ্তি পাইলাম প্রস্তরের কারুকার্য্য ও গঠন শিল্প সৌন্দর্য্যের দিক হইতে অন্য কোন মন্দিরে তাহা পাই নাই। দাক্ষিণাত্যে এমন বৃহৎ স্থন্দর মন্দিরও আর নাই। কাঞ্চিপুরমের মন্দিরমণ্ডপের কারুকার্য্য এবং শ্রীরঙ্গম মন্দিরের বিশালত্ব ভুলিয়া যাই নাই। কিন্তু তাহা মীনাক্ষী দেবীর এই মন্দিরের ন্যায় এমন স্থসঙ্গত ভাবে গঠিত সজ্জিত বা সৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে। শ্রীরঙ্গম মন্দির মনের মধ্যে বিশালত্বের একটা ছাপ ফেলিলেও হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের এমন একটা মহান সৌন্দর্য্যের ছবি মনে আঁকিয়া দেয় না। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে স্থানে প্রথম প্রবেশদ্বার গোপুরম সেখান হইতে প্রায় এক হাজার ফুট দূরে দেবী তাঁহার

মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মন্দিরের এমনি সুন্দর গঠন পারিপাট্য যে আগাগোড়া সোজা একটির পর অন্য দুয়ার একটি প্রবেশদ্বারের ও সুদীর্ঘ প্রকোষ্ঠসমূহের মধ্য দিয়া ঐ সুদূরে মীনাক্ষী দেবীর অবস্থিতিকক্ষে দৃষ্টি চলিতেছে। বরাবর প্রতি দুয়ারে প্রদীপের মালা ঝলমল করিতেছে। প্রথম দ্বারে ১০০৮ প্রদীপ, মায়ের অবস্থিতি মন্দির দ্বারে ১০৮ প্রদীপ ও মাঝে মাঝে প্রতি দুয়ারে বহু প্রদীপ মালাকারে সাজান রহিয়াছে। মায়ের দুয়ার সম্মুখে দীপদ্বারা লিখিত ওঁ অক্ষর ঐই প্রদীপ মালার মধ্যমণি স্বরূপ জ্বলিতেছে। এই দীপ মালা পর পর দেখাইয়া দেয়—ঐ মায়ের মন্দির দ্বার। মন্দির মধ্যে বিজলী আলোর ব্যবস্থা থাকিলেও সন্ধ্যাবেলা এই প্রজ্জ্বলিত দীপমালার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তাহা দৃষ্টির প্রচ্ছদপটে চলিয়া যায়। মন্দির মধ্যে দীপ সমুদয় একমাত্র গাওয়াঘিতে প্রজ্জ্বলিত হয়। মন্দিরে দেবদেবী সকলের পূজায় প্রতিদিন যে পরিমাণ চন্দন ব্যবহৃত হয় তাহা প্রস্তুত জন্য মন্দিরে পাথরের পেষণযন্ত্র আছে।

মন্দিরের চারিদিকে চারিটি বৃহৎ গোপুরম তোরণদ্বার আছে। তাহা ছাড়া মন্দিরের সদর দুয়ার পূর্ব্ব দিকে দুটি তাহার পর আরো তিনটি শিবমন্দিরের পশ্চাতে দুটি ও

মীনাক্ষী মন্দিরের সম্মুখে একটি—প্রধান চারিটি গোপুরম ছাড়া এই আরো আটটি গোপুরম আছে। দক্ষিণের গোপুরমটি সর্ব্বোচ্চ ও প্রায় ২০০ ফুট উঁচু হইবে—উপরের দিকে ইহার চূড়ার গঠনে একটু বক্রতা (carvature) আছে। এই গোপুরমটী চারিধারে প্রস্তরের বড় বড় দ্বারপাল দেব দেবী ও নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে ও উর্দ্ধে ভগবানের দিকে লোকের মনকে লইয়া যাইবার প্রেরণা দিতেছে।

মন্দিরের সমুদয় প্রাঙ্গণটি প্রবেশদ্বার হইতে আগা গোড়া প্রস্তর বাঁধান। সদর দ্বারে প্রথম প্রবেশ করিয়াই সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে পূজার ফুলের ও পূজার অন্যান্য উপকরণের দোকান রহিয়াছে। এই স্থানে প্রথমেই এই প্রকোষ্ঠের দেয়াল গায়ে উঁচুতে মীনাক্ষীর জন্ম ও বিবাহ ইতিহাস চিত্রে অঙ্কিত ও বর্ণিত রহিয়াছে। মাদুরার পাণ্ডুরাজার কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি পার্ব্বতীর উপাসনা করেন। পার্ব্বতী রাজাকে যজ্ঞ করিবার জন্য বলেন। রাজা যজ্ঞ করিলে তাঁহার যজ্ঞাগ্নি হইতে পার্ব্বতী স্বয়ং রাজার দুহিতা স্বরূপে জন্ম লইলেন। এই দুহিতা

মাদুরার মন্দিরে গোপুরম্ ও স্বর্ণপদ্ম সরোবর

(৬০ পৃষ্ঠা)

পার্ব্বতী বড় হইয়া এখানকার রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। প্রহরণ ধারিণী যোদ্ধরাণী রূপে পার্ব্বতী রণপ্রিয়া হইয়া উঠিলেন। একবার মহাদেব শিবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ মধ্যে যাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন তিনি যে স্বয়ং শিব ইহা বুঝিতে পারিয়া পার্ব্বতী লজ্জিতা হইলেন ও পরে শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এই আখ্যানটি মন্দিরের প্রবেশ পথে দেওয়ালে চিত্রের দ্বারা বর্ণিত রহিয়াছে। মৎস্তের চক্ষুর ন্যায় চক্ষু উজ্জ্বল বলিয়া দেবীর নাম মীনাক্ষী। শিব যে সকল অলৌকিক ঘটনা করিয়াছেন তাহাও এই দেওয়ালে চিত্রাঙ্কনে দেখান আছে। এই প্রবেশ প্রকোষ্ঠের অপর দিকে অনেক কাঁচের চুড়ির দোকান আছে, নারীরা মীনাক্ষী মন্দিরের এই চুড়ি পরা বিশেষ শুভ ও মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করেন, সধবা যাঁহারা পূজার্থিনীরূপে মন্দিরে আসেন সকলেই এই স্থানে চুড়ি কেনেন ও পরেন। এই প্রবেশ প্রকোষ্ঠ দিয়া কিছুদূর আসিয়া বাঁদিকে স্বর্ণ পদ্ম সরোবর golden lotus tank ; কোন কালে ইহাতে স্বর্ণ বর্ণ পদ্ম হইত বলিয়া ঐ নাম। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ এবং উত্তর দিয়া বরাবর লম্বা ছাদ দেওয়া বারান্দা বা সুপ্রশস্ত অলিন্দ

পথ রহিয়াছে। আমরা দক্ষিণ বারান্দার ছাদে উঠিয়া মন্দিরের সমস্ত গোপুরমগুলির এবং মীনাক্ষী মন্দিরের ও শিব সোমসুন্দরের মন্দিরের বিমানের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়ার কারুকার্য্য সব একসঙ্গে দেখিতে পাইলাম। কি মহান দৃশ্য এবং দুই দেব মন্দিরের সুবর্ণ বিমান দু'টি কি মহিমান্বিত উজ্জ্বল। এই স্থানের পুষ্করিণীর জল স্পর্শ করিয়া অথবা ইহাতে স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকের বাঁধান ঘাটের টানা লম্বা সিঁড়ি পশ্চিম দিকের দীর্ঘ বারান্দায় গিয়া উঠিয়াছে। পূজার্থীগণ স্নানান্তে ঐ বারান্দায় প্রথমে উঠিয়া মায়ের মন্দিরে আসিতেছে। মীনাক্ষী দেবীর প্রিয় এবং তাঁহার হাতের নিদর্শন বলিয়া এই বারান্দায় অনেকগুলি কাকাতুয়া পাখী ঝুলান রহিয়াছে। প্রদক্ষিণ ও এক দেবালয় হইতে অন্য দেবালয়ে যাইবার জন্য চারিদিকেই প্রস্তর স্তম্ভের উপর ছাদবিশিষ্ট দীর্ঘ বারান্দায় মন্দিরটি বেষ্টিত। চারিদিকের এই বারান্দা অলিন্দগুলি মীনাক্ষী মন্দিরের সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষত্ব। সরোবর হইতে সিঁড়ি যে দীর্ঘ বারান্দাটীতে উঠিয়াছে ঐ বারান্দাটী মীনাক্ষীর মন্দির দিকে গিয়াছে, প্রথমেই তাহার স্তম্ভগুলির শিল্প সৌন্দর্য্যে

আকৃষ্ট হইতে হয়। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ভীম প্রভৃতির মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিসহ এক এক খণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর হইতে ঐ স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত। উহাতে পুষ্পলতাদির কারুকার্য্য রহিয়াছে—ছাতের তলে নানা পৌরাণিক চিত্র শোভা পাইতেছে। এইখানে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির পথের দক্ষিণ দিকে সিদ্ধিদাতা গণেশের এবং বামদিকে সুব্রহ্মণ্যদেব কার্ত্তিকের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইস্থানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন দেখিলাম। আমরা গণেশ ও কার্ত্তিকের মন্দিরে পূজার্চ্চনা সারিয়া মীনাক্ষীর মন্দিরে গেলাম। মন্দির পথে মহাদেবের কিরাত মূর্ত্তি ও মীনাক্ষীর কিরাতপত্নী মূর্ত্তি রহিয়াছে। মীনাক্ষীর মন্দিরের বহির্দেওয়ালের উপর তৈল চিত্রে অঙ্কিত মীনাক্ষীর বিবাহের দুইখানি বড় ছবি রহিয়াছে। মহাবিষ্ণু মীনাক্ষীর ভ্রাতারূপে মীনাক্ষীকে শিবহস্তে সম্প্রদান করিতেছেন—এই চিত্রে কি সুন্দর ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। মন্দির দ্বারের দুই পার্শ্বে নানা প্রস্তর মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরের পিতলের কপাটে অসংখ্য প্রদীপ লাগান আছে। মন্দির গর্ভে মাঝখানে লম্বা বেদী গাঁথা তাহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেবীকে দর্শন করিতে হয়। আমরা এই বেদী

উত্তীর্ণ হইয়া মায়ের প্রকোষ্ঠ দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম ও পূজার্চ্চনা করাইলাম। কি অপূর্ব্ব দেবী মীনাক্ষীর রূপ! কৃষ্ণপ্রস্তরের উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রশান্ত ভাবে সোজা দাঁড়াইয়া আছেন; ফুলমালায় বক্ষ সমাচ্ছন্ন, কটী দেশের নীচে স্বুবর্ণবসন পুষ্পলতার ন্যায় জড়াইয়া পরান্ রহিয়াছে, মুখে নয়নে সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা দিব্যজ্যোতি মূর্ত্তিটীকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কর্পূর আরতির আলোকে মার রূপচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িল—মনে হইল জীবনের অশেষ পুণ্যে আর মায়ের অপার করুণায় এই পুণ্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।

মাকে প্রাণের প্রণতি জানাইয়া তাঁহার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পর এই স্থানে চণ্ডীমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা সোমসুন্দরের মন্দির দেখিতে চলিলাম। মীনাক্ষীর স্বামী শিবকে সোমসুন্দর বলা হয়। মীনাক্ষীর মন্দিরের বামদিকে সোমসুন্দরের মন্দির। সোমসুন্দরের মন্দিরটী তাহার নানা কারুকার্য্যময় উচ্চ স্বুবর্ণ বিমান সহ ধূসর প্রস্তর নির্ম্মিত আটটী বৃহৎ হস্তীর মস্তকোপরি অবস্থিত। আটটী হস্তী বিভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া শুঁড় তুলিয়া একটা জীবন্ত বাস্তবতার ভাব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের

গঠন ভাস্কর্য্যে মোহিত হইতে হয়। প্রবেশদ্বারের দিক হইতে চারটী মণ্ডপ পার হইয়া সোমসুন্দরের মন্দিরে পৌছিতে হয়। দূরে যেস্থানে সোনার ধ্বজাস্তম্ভ স্থাপিত সেখান হইতেই সোমসুন্দরের মন্দিরদ্বার দেখা যায়। মধ্যস্থিত এই মণ্ডপগুলি প্রত্যেকটী একশত স্তম্ভের উপর স্থাপিত ও প্রত্যেক স্তম্ভটী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সহ এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত এবং প্রত্যেক মণ্ডপ দীর্ঘ অলিন্দে পরিবেষ্টিত।

মন্দিরের মধ্যে প্রস্তরের নানা কারুকার্য্যময় এই শত স্তম্ভোপরি যে মণ্ডপগুলি রহিয়াছে ও তাহাদিগের চতুস্পার্শে যে দীর্ঘ অলিন্দ চলিয়া গিয়াছে চোখে না দেখিলে মনের মধ্যে তাহার ছবি ফুটাইয়া তোলা কঠিন। যাহাই হউক সোমসুন্দরের মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে মন্দির সম্মুখে এই মণ্ডপগুলিতে স্তম্ভে স্তম্ভে যে সব প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহার কতকগুলির মাত্র যাহা স্মরণ আছে তাহার পরিচয় দিতেছি। আগেই বলিয়াছি সব স্তম্ভগুলি monolythic অর্থাৎ তাহাতে খোদিত মূর্ত্তিসহ বৃহৎ একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর হইতে তাহা প্রস্তুত—এই স্তম্ভগুলিই মন্দিরের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য। এই স্তম্ভগুলির কোনটীতে হরপার্ব্বতী কোনটীতে

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি কোনটীতে শঙ্কর নারায়ণ মূর্ত্তি কোনটীতে মহাকাল মূর্ত্তি কোনটীতে নটরাজ মূর্ত্তি কোনটীতে গজানন মূর্ত্তি কোনটীতে মার্কণ্ডেয় মূর্ত্তি কোনটীতে কালবরাহ মূর্ত্তি কোনটিতে বীরভদ্র কোনটীতে অগ্নি বীরভদ্র মূর্ত্তি কোনটীতে অঘোরবীরের—কণ্ঠে মালা হস্তে ধনুক ও কৃপাণ বিশিষ্ট মূর্ত্তি সকলেই ভাবের সুন্দর অভিব্যক্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তির কথা বিশেষ করিয়া বলা দরকার। একটী মূর্ত্তি দেখিলাম ত্রিপুরান্তক মূর্ত্তি—এই দেবমূর্ত্তি কাম ক্রোধ লোভ তিন অসুরকে দমন করিতেছেন। এই তিন অসুরকে দমন করিতে হইলে যে ধর্ম্ম সাধনার প্রয়োজন মূর্ত্তিটীতে ভাস্কর সেই সাধনা ও শক্তির ভাব বিকাশ করিয়াছেন। নটরাজ মূর্ত্তি অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের রহিয়াছে। একটি নটরাজ মূর্ত্তিতে দেখিলাম, নটরাজের এক পদতলে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে ও অন্যপায়ে একটী সর্প জড়াণ আছে। সর্পটী সংসারের ও স্ত্রীমূর্ত্তিটী মায়ার প্রতীক—নটরাজের পদতলে ঐ দুইটী প্রতীকের দ্বারা শিল্পী দেখাইতেছেন যতক্ষণ ঐ দু'টীকে পদতলে না দমন করিতে পরিতেছ ততক্ষণ নৃত্য

করিবার ও প্রকৃত আনন্দ পাইবার সম্ভাবনা নাই—তাই ঐ দুইটীকে পদতলে সংহার করিয়া নটরাজ অপার্থিব উল্লাসে নৃত্য করিতেছেন। ভাস্করের কি সুন্দর কল্পনা ও ধর্ম্ম মন্দিরের উপযুক্ত প্রতিমূর্ত্তিই বটে। মহাদেব শিবের কত রকমের রূপমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। একটী মন্দিরে তাঁহার চৌষট্টী প্রকার লীলামূর্ত্তি দেখান আছে। একস্থানে চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি রহিয়াছে, একস্থানে ঋষভবাহন মূর্ত্তি একটী দেখিলাম তাহার ভাবের অভিব্যক্তি বড় সুন্দর। হরপার্ব্বতী বৃষের উপর বসিয়া আছেন—বৃষ তাহার স্কন্ধ ঘুরাইয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া হরপার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে—এই মূর্ত্তিতে শিল্পী ভাস্কর এই ভাব ফুটাইয়াছেন যে বৃষ করুণ দৃষ্টিতে হরপার্ব্বতীকে জানাইতেছে— চিরদিন তোমাদিগকে পিঠে করিয়া বহিয়াই আসিলাম—তোমাদের শ্রীমুখ দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হয়না তাই আজ নয়ন ভরিয়া তোমাদিগকে দেখিতেছি—ভক্তিপ্রকাশের কি সুন্দর কল্পনা।

অতঃপর নবগ্রহ মূর্ত্তিগুলি পার হইয়া সোমসুন্দরের মন্দির সম্মুখে আসিতে হয়। মন্দিরের সন্নিকটে আর একটী বড় সুন্দর প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। আমরা

মীনাক্ষী মন্দিরে তৈলচিত্রে মীনাক্ষী দেবীকে মহাবিষ্ণু বিবাহে সম্প্রদান করিতেছেন যে দেখিয়াছি ঠিক সেই চিত্রটী এখানে প্রস্তরে খোদিত রহিয়াছে। প্রস্তরের এই মূর্ত্তিতেই যেন সৌন্দর্য্য অধিক ফুটিয়াছে এবং সম্ভবত এই মূর্ত্তি দেখিয়াই চিত্রকর রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত তৈলচিত্র দু'টী পরে অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রস্তর মূর্ত্তিতে সোম-সুন্দর এবং মীনাক্ষীর দুই করকমল একত্রে স্পর্শ করিয়া আছে—মহাবিষ্ণু কমণ্ডলু হইতে তাহাতে জল প্রক্ষেপ করিতেছেন। দু'জনের করকমল একত্রে স্পর্শ এবং তাহাতে কমণ্ডলুর জল প্রক্ষেপ তৈল চিত্রখানিতে নাই। পাথরে খোদা মূর্ত্তিতে এই প্রকার সম্প্রদানের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সোমসুন্দরের মন্দির সম্মুখে উচ্চ প্রস্তরমঞ্চে সরুস্তম্ভযুক্ত রথের আকারে একটী মণ্ডপমধ্যে তাঁহার বাহন বৃষ মূর্ত্তি সোমসুন্দরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। এই স্তম্ভযুক্ত সমুদয় মণ্ডপটী তাহার শীর্ষে শিকল ইত্যাদির কারুকার্য্য ও মধ্যস্থিত বৃষ সহ একখানি গ্রেনাইট প্রস্তরখণ্ড হইতে নির্ম্মিত। কৃষ্ণপ্রস্তর মণ্ডপ মধ্যে এই বৃষ মূর্ত্তিটী ভাস্করের মহান কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সোমসুন্দরের প্রবেশ দ্বারের নিকট পাথরের

দুটী সুবৃহৎ দ্বারপাল মূর্ত্তি এবং শ্রীগায়ত্রী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই স্থানেই সরস্বতী ও লক্ষ্মী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। সোমসুন্দরের মন্দির গাত্রে দেবদেবী প্রভৃতি কত বিভিন্ন মূর্ত্তির কারুকার্য্য মন্দিরটীকে ভূষিত করিয়াছে। ইহার প্রবেশদ্বারে সোমসুন্দরকে যে সব ভক্ত পূজা করিতে আসিতেছেন সেই ভক্তদিগকে আহ্বান অর্চ্চনা করিতেছে এমন একটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। ভগবানের ভক্তকে পূজা করিয়া ভগবানকে লাভ করা যায় ইহাই দেখাইবার জন্য বোধ হয় ঐ মূর্ত্তি! মন্দির মধ্যে সোমসুন্দরের কৃষ্ণ প্রস্তরের লিঙ্গমূর্ত্তি তাহার শিরোপরি স্বর্ণ সর্প পশ্চাৎ হইতে ফনা বিস্তার করিয়া আছে। এই মূর্ত্তিকে আমরা পূজার্চ্চনা ও কর্পূর আরতির আলোকে দর্শন করিলাম। মন্দির পরিক্রমন কালে মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণ পা তুলিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য ভঙ্গিতে একটী বৃহৎ নটরাজ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আরও ৪।৫টী নটরাজ মূর্ত্তিতে নটরাজ বামপদ তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

সোমসুন্দরের মন্দির যে বৃহৎ হস্তীমূর্ত্তিগুলির উপর স্থাপিত ঐ হস্তি সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য গল্প আছে। এই মন্দিরপাশে এক সিদ্ধপুরুষ থাকিতেন তিনি এই হস্তীকে

দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এক অবিশ্বাসী পাণ্ডুরাজা এই সিদ্ধপুরুষকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন এই হস্তী যদি সত্যই ইন্দ্রের হস্তী হয় তবে ইহাকে জীবন্ত হস্তীর ন্যায় ইক্ষু খাওয়াইতে পার কি ? সিদ্ধপুরুষ সোম-সুন্দরের শরণাপন্ন হইয়া রাজাকে বলেন—আপনি ইক্ষু দিলেই হস্তী খাইবে। রাজা এই প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীকে ইক্ষু আনিয়া দিলে ঐ হস্তী সত্যসত্যই সেই ইক্ষু খাইয়াছিল। তখন ঐ পাণ্ডু রাজা বুঝিয়াছিলেন স্বয়ং সোমসুন্দরই ঐরূপ করাইয়াছেন এবং সেই হইতে তিনি সোমসুন্দরের মহাভক্ত হন্।

পূর্ব্বে মাতুরার এইস্থানে বৃহৎ কদম্ব বন ছিল। বৃত্রসংহার করিবার পর ইন্দ্র ভূলোকে ভ্রমণ করিতে আসিয়া সেই কদম্ববনে এই সোমসুন্দর লিঙ্গকে দর্শন পাইয়া বৃত্রকে হত্যা করার পাপ হইতে মুক্ত হন এবং এই স্থানে এই মন্দির করিয়া ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন। প্রবাদ এই যে এইস্থানে সোমসুন্দরের নির্দ্দেশ মত একটী গোক্ষুরা সাপ কদম্ববনে যে ১২ মাইল স্থান দেখাইয়া দিয়াছিল সেইস্থান ব্যাপিয়া মাতুরা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শুনিলাম মাদুরা মানে মিষ্ট—এই নগরের প্রকৃত নাম তাহা হইলে মধুরা—

তাহাই অপভ্রংশ হইয়া মদুরা ও মাদুরায় দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হোক পুরাকালের ঐ কদম্ববনের ১টী কদম্ব বৃক্ষ সোমসুন্দরের এই মন্দির পাশে মণ্ডপ মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডালপালা হীন বৃক্ষটীর শুষ্ক কাণ্ড মাত্র রক্ষিত আছে—তাহা দেখিয়া বহুকালের পুরাতন কাষ্ঠ বলিয়াই মনে হইল। এইস্থানে সুব্রহ্মণ্য দেবের একটী মূর্ত্তি রহিয়াছে।

সোমসুন্দরের মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমরা মন্দিরের সহস্রস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ দেখিতে গেলাম। এই মণ্ডপটী প্রস্তর ভাস্কর্য্যের আর একটী চিত্তাকর্ষক দেখিবার জিনিষ। এই এক হাজার প্রস্তর স্তম্ভে কোনটীতে দ্বার পাল-মূর্ত্তি কোনটীতে সুব্রহ্মণ্যদেব মূর্ত্তি কোনটীতে কলিমূর্ত্তি (পুরুষ নারীকে স্কন্ধে করিয়া দাঁড়ান মূর্ত্তি) কোনটীতে অর্জ্জুন কোনটীতে দ্রৌপদী কোন কোনটীতে অন্য পাণ্ডব-দিগের মূর্ত্তি কোনটীতে হরিশ্চন্দ্রের মূর্ত্তি কোনটীতে লক্ষ্মী কোনটীতে সরস্বতী মূর্ত্তি কোনটীতে রতির মূর্ত্তি কোনটীতে ইন্দ্র কোনটীতে হরপার্ব্বতী ইত্যাদি মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তিসহ প্রত্যেক স্তম্ভটি এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত এবং এই এক হাজার স্তম্ভ সমান

থাকে সমান সাদৃশ্যে সমান দূরত্বে মণ্ডপ তলে শ্রেণি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেদিক হইতেই দেখা যাক না কেন প্রত্যেক দিকেই সমান ফাঁকে সোজা স্তম্ভশ্রেণি দেখা যাইতেছে। মণ্ডপটী প্রস্তর সৌধের একটী সুন্দর দৃশ্যপট স্বরূপ চোখের উপর ভাসিতেছে। এই মণ্ডপের স্তম্ভস্থিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোন কোন মূর্ত্তি, বিশেষ করিয়া দেখিলাম রতিমূর্ত্তি, সপ্তস্বর দিয়া নিৰ্ম্মিত—ঘা দিলে সা রে গা মা প্রভৃতি ৭টী স্বরের আওয়াজ বাহির হয়। এই বিশাল উৎসব মণ্ডপের অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে মণ্ডপের শেষ প্রান্তে একটী সুন্দর বৃহৎ নটরাজমূর্ত্তি অপরূপ নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। উৎসব সময়ে মীনাক্ষীর ভোগমূর্ত্তিকে এইস্থানে আনা হয়। দেবী মীনাক্ষী ও সোমসুন্দরের উৎসব গীত বাদ্যাদি স্থাপত্যসৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ এই মহামণ্ডপে সম্পন্ন হয়। সোমসুন্দরের সুদূর সম্মুখে এই মণ্ডপের নিকটে যে মন্দিরের প্রবেশ দ্বার আছে তাহা দিয়া মন্দির হইতে কেহ বাহির হননা। প্রবাদ এই যে এই দ্বার দিয়া বাহির হইলে পাপেরকবলে পড়িতে হয়।

সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপের নিকটে মীনাক্ষীর মন্দির নিৰ্ম্মাতার এক অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার পর আমরা মীনাক্ষী

সোমসুন্দরের বিবাহউৎসবমণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। ইহার সুবৃহৎ ছাতিতল কোণ আকৃতিতে কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এইস্থানে বৎসরে একবার করিয়া দেবদেবীর বিবাহ উৎসব হয়। একটী বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের উপর বিবাহ সম্পন্ন হয়। পুরাকালে সোমসুন্দরের সহিত মীনাক্ষীর বিবাহ লইয়া মহাদেবের অলৌকিকতা সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে সোমসুন্দর একটীমাত্র অনুচর সহ বিবাহ করিতে আসেন তাহাতে মীনাক্ষী বলেন আমি লক্ষ লোকের আয়োজন করেছি আপনি একজন মাত্র লোক লইয়া আসিলেন কি রকম ? আমি ক্ষুধার্ত্ত আমাকে খাইতে দাও বলিয়া মহাদেব আয়োজিত সমুদয় খাদ্য ও পানীয় জল খাইয়া নিঃশেষ করেন। অতঃপর তাঁহার অনুচর জল পান করিতে চাহিলে তাহাকে বলেন—যাও অদূরে গিয়া হাত বাড়াইলেই জল পাইবে—অনুচর ঐ নির্দ্দেশ মত গিয়া যেস্থানে জল প্রার্থনা করেন সেখানে একটী নদী প্রবাহিত হইয়া গেল—ঐ নদীর নাম হইল 'ওয়াইথাই'। তামিল ভাষায় "ওয়াইথাই" মানে 'হাত বাড়াইলেই জল'। মাদুরার মধ্যস্থিত এই ওয়াইথাই নদীর দীর্ঘ সেতুর উপর আলোক-সজ্জিত সুপ্রশস্ত রাস্তা বিভক্ত মাদুরাকে সংযুক্ত করিয়া

আছে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে এই নদী 'ভাগাই' বলিয়া লিখিত আছে।

মন্দির মধ্যে মীনাক্ষীর মন্দির পথে একটী প্রকোষ্ঠে একখানি চৌপল স্বর্ণ আসন ঝুলিতেছে—তাহাতে দেব দেবী দোল খাইয়া থাকেন এবং তখন সৃষ্টি প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। একটী বারান্দার সম্মুখে রৌপ্য মণ্ডিত প্রস্তরের একটী বৃহৎ গনেশ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটী তিরুমলনায়েক রাজা পদ্ম সরোবর হইতে পাইয়াছিলেন। মন্দিরের এই সকল অংশ দেখিবার পর মন্দির মধ্যে দুটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখিলাম তাহাতে উৎসব সময়ে মীনাক্ষী ও সোমসুন্দরের ভোগ মূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রার জন্য অনেক রকম মূল্যবান ও বিস্ময়কর আসবাবপত্র ও হাতিঘোড়ার মূর্ত্তি সকল রহিয়াছে। মীনাক্ষী এবং সোমসুন্দর দুজনকেই দুটী পৃথক বাহনোপরি লইয়া যাওয়া হয়। দুইটী করিয়া স্বর্ণ মণ্ডিত বিপুলায়তন কাঠের হাতি ও ঘোঁড়া এবং রৌপ্য মণ্ডিত বৃষ রহিয়াছে—স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত এই বৃহৎ বাহন-গুলির গঠন সৌন্দর্য্য ও জাঁকজমক দেখিবার জিনিষ। বাহনগুলির পিঠের স্বর্ণমণ্ডিত হাওদা, মিছিলের সঙ্গে বাহির করিবার জন্য স্বর্ণমণ্ডিত রথ, স্বর্ণমণ্ডিত সিংহমূর্ত্তি—

নারীর মুখ লইয়া ময়ূরের পুচ্ছ এবং পাখা লইয়া স্বর্ণমণ্ডিত কামধেনু মূর্ত্তি, কৈলাশ হইতে শিবকে আনিতে তাঁহাকে বীণা বাজাইয়া তুষ্ট করিতেছেন এইরূপ একটী রাবণের মূর্ত্তি, কল্পতরুর মূর্ত্তি—ব্রহ্মার হংসসিংহাসন, নন্দিমূর্ত্তি, কাকাতুয়ার মূর্ত্তি—এই সকল দিয়া প্রকোষ্ঠ দুটী পূর্ণ রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সবই স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মণ্ডিত হইয়া মন্দিরের দেবতার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। দেবতাদিগের বহু টাকার মণিমুক্তা ও স্বর্ণালঙ্কার যাহা আছে তাহা আমাদিগের দেখার সুবিধা হইল না।

মুগলদিগের রাজত্বকালে এই মন্দির মুসলমানগণ কর্ত্তৃক একবার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তখন ৮টী হাতির উপর সোমসুন্দরের মন্দিরাংশের কোন অনিষ্ট হয় নাই। মন্দিরের অন্যান্য অংশ যাহা ধ্বংস হইয়াছিল বিজয়-নগরের রাজা তিরুমলনায়েক প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার সংস্কার ও মন্দিরটী পুনর্নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে তিরুমলনায়েকের চিত্রিত প্রস্তর মূর্ত্তি তাঁহার সিংহল ও তাঞ্জোরের দুই রাণী সহ প্রতিষ্ঠিত আছে। তিরুমলনায়েক ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত হিন্দুরাজা ছিলেন। তাঁহার

দূরস্থিত প্রাসাদ হইতে মন্দিরে আসিবার সুড়ঙ্গ পথ ছিল। তিনি প্রতিদিন মন্দিরে আসিয়া মীনাক্ষী ও সোমসুন্দরকে দর্শন পূজা করিতেন। একদিন মীনাক্ষীর মন্দির প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হন নাই—তিনদিন পর দুয়ার খুলিয়া দেখা গেল তিনি সেখানে নাই। রাজা তিরুমল নায়েকের তিরোধান খুবই করুণ ও অলৌকিক।

আমরা সকালে যখন এই মন্দির দেখি তখন মন্দিরের বাজনা শুনিয়া ও মন্দিরের বড় বড় হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের দেবদেবীর আশীর্ব্বাদের ফুলমালা চন্দন কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রসাদের সম্ভার বহন করিয়া রামনদ রাজার অতিথিবাটীতে আমাদিগের আশ্রয় স্থানে ফিরিলাম। আমরা পুনরায় রাত্রিতে মীনাক্ষী মন্দিরের দীপমালার আলো এবং দেবদেবীর আরতি দেখিতে গেলাম। এই মন্দিরের আলোক ও আরতি উপভোগ করিবার বিষয়। ডঙ্কা ঢাকের বাজনার তালে সানায়ের মধুর সুর কানে সুধা ঢালিয়া দেয়। দাক্ষিণাত্যের সানায়ের সুর আমাদিগের দেশের সানায়ের সুর অপেক্ষা অন্য রকমের —বেশ মোটা মিষ্টি আওয়াজ। ঐ বাজনাকে মধ্যে মধ্যে

থামাইয়া মন্দিরের ব্রাহ্মণ একটী একতারা বাজাইয়া উচ্চতালে মহাদেবের স্তুতি গান করেন। রাত্রিতে সোমসুন্দর মীনাক্ষীর মন্দিরে এক প্রকোষ্ঠে ঝুলান একটী স্বর্ণআসনে শয়ন করিতে আসেন—তাঁহাকে তখন মশালের আলো জ্বালিয়া বাজনা বাজাইয়া লইয়া আসা হয়। মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে যেসব ন্যাস ও দান আছে তাহার সংখ্যা অন্যূন ৩৫।৩৬টী হইবে। মীনাক্ষীর শয়ন-মন্দিরে আসিতে দীর্ঘ বারান্দাপথের ধারে এইসব দানপতি-দিগের অনেকেরই একটী করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। সোমসুন্দরকে বহুদূর লইয়া দীর্ঘ কার্পেট বিস্তৃত ঐ বারান্দার পথ দিয়া যখন আলো বাজনা করিয়া ব্রাহ্মণের কাঁধে পাল্কী করিয়া আনা হয় তখন ঐ পথের ধারে দানপতি-দিগের প্রত্যেক বিগ্রহমন্দির সম্মুখে তাঁহাকে রাখিয়া প্রত্যেক মন্দির হইতে প্রজ্জ্বলিত একটী করিয়া বহু প্রদীপের ঝাড় দিয়া ও কর্পূর জ্বালিয়া আরতি করা হয়। সোমসুন্দর এমনি করিয়া প্রতিনিশি মীনাক্ষীর শয়নপ্রকোষ্ঠে আসেন—সেখানে তাঁহাকে ভোগ দিয়া শুয়াইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও শয়নান্তে কিছুক্ষণ ঐ স্থানে বাজনা ও স্তুতিগান করা হয়। মহাদেবের এই শয়ন আরতি দেখিয়া আমরা মন্দির

হইতে বিদায় লইলাম। মন্দিরের বিশালতা মণ্ডপাদির স্থাপত্য শিল্প সৌন্দর্য্য ও মীনাক্ষী সোমসুন্দরের মধুর মূর্ত্তি মন হইতে কখনো মুছিয়া যাইবে না। মিঃ আর, এস, নাইডু দেবস্থান আইন অনুসারে মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারী আমাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে মন্দির দেখাইয়াছিলেন।

মাদুরাতে আমরা ২৯শে ৩০শে ডিসেম্বর দু'দিন ছিলাম। প্রথমদিনই সকালে মন্দির দেখিয়া বিকালে মন্দির হইতে প্রায় দু'মাইল দূরে রামনদ রোডে মীনাক্ষী সোমসুন্দরের জলবিহারের সরোবর টেপ্পাকুলম্ দেখিতে যাই। এই বৃহৎ চতুষ্কোণ সরোবরটী এক এক ধারে এক ফারলং করিয়া লম্বা হইবে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী দ্বীপে উদ্যান কানন-বেষ্টিত ঘন বৃক্ষছায়াসমন্বিত একটী মন্দির দেবদেবীর বিশ্রাম স্থানরূপে রহিয়াছে। নৌকাতে পার হইয়া আমরা এই বিশ্রামমন্দির দেখিয়া ঐ মন্দির কানন হইতে কাঁচা আম ডাব ও পুষ্পাদি লইয়া আসিলাম।

এই বিহার সরোবরের সন্নিকটেই মীনাক্ষী মন্দির নির্ম্মাতা মহাপ্রাণ রাজা তিরুমল নায়েকের রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদ একটী সুউচ্চ একতলা সৌধ আগাগোড়া খিলানের উপর

প্রস্তত—কোনখানে একটী কড়ি কিম্বা কোন বরগা নাই। প্রাসাদের স্তম্ভগুলি চল্লিশফুট এবং ছাতের তল বিরাশিফুট উঁচু। ১৬২৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ অঃ অবধি ৩৬ বৎসর ধরিয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ টিপু স্থলতান ধ্বংস করিয়া মহীশূরে লইয়া যান। জগতে কোন্ জিনিষের কি পরিণাম ও কি পরিণতি হয় তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই প্রাসাদ এখন মাদুরার দেওয়ানী আদালত স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে! যেস্থানে এককালে রাজার দরবার হল ছিল সেখানে এখন জজের 'সেসন্ আদালত'!—এই হলটীর গম্বুজ উচ্চে ৭৫ ফুট ইহার পরিধি ২০৭ ফুট এবং ডায়েমেটার ৬৩ ফুট। বিচার কার্য্যের সময় বিশেষতঃ উকীলের বক্তৃতাকালে আদালতগৃহে প্রতিধ্বনির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গম্বুজটীর তলায় এখন একটী কাঠের ছাদ করিয়া লওয়া হইয়াছে। যেখানে রাজার শয়নকক্ষ ছিল সেখানে সব্‌জজের এজলাস হয়—ইহাপেক্ষা দুঃখের ও হাস্যকর ব্যাপার আর কি আছে! ইংরাজ আমলে প্রায় সর্ব্বস্থানেই আদালত গৃহ নূতন করিয়া প্রস্তত —এখানেও তাহাই হইলে এমন স্থন্দর এই রাজপ্রাসাদটীর

এই শোচনীয় পরিণাম হইত না। ইংরাজ শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জন ভারতের পুরাতন মন্দিরাদি রক্ষাকল্পে আইন করায় ভারতের বহুলুপ্ত গৌরবচিহ্ন, দেবস্থান, মঠ, পুরাতন প্রাসাদ আদি আবার লোকের চক্ষুগোচর হইয়াছে। সেই আইনের প্রচলন সত্ত্বেও রাজা তিরুমলের এই সুন্দর প্রাসাদটী দেওয়ানী আদালতে রূপান্তরিত হওয়া দেখিয়া খুবই ব্যথিত হইলাম। এই প্রাসাদের প্ল্যান ইটালী হইতে একজন ইঞ্জিনিয়ার আনাইয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণে করান হইয়াছিল। ইহার দেওয়ালগুলি সাতফুট করিয়া প্রশস্ত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে চূণ এবং সিমেণ্ট একত্রে মিশাইয়া এমন একটী সুন্দর ঈষৎ পিঙ্গল রং করা আছে যাহাতে এ অবধি আর কখনো রং করা বা চূণগোলাফিরণ হয় নাই, তবু তাহা উজ্জ্বল হইয়া আছে। মাদুরাতে চারশত এডভোকেট্ উকীল আছেন—তাঁহাদিগের 'বার এসোসিয়েশন' গৃহ এবং বসিবার স্থান এই প্রাসাদের একাংশে। অপরাপর অংশে মুন্সেফী আদালত—দপ্তরখানা ইত্যাদি আছে। মাদুরায় দেওয়ানী আদালতের একজন পুরাতন পিওন আমাদিগকে এই প্রাসাদটী দেখাইয়াছিল ও প্রাসাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু সব বলিয়াছিল। মাদুরাতে একটী বৈষ্ণব মন্দির আছে

সেখানে মথুরাপতি সুন্দররাজ ও মহালক্ষ্মী বিগ্রহ দর্শন করিলাম—এই মন্দিরে মথুরাপতি বিগ্রহের নাম শুনিয়া মনে হইল ইহার আসল নাম মদুরা বা মধুরাপতি নয় তো ? অথবা উত্তর ভারতের মথুরাপতিকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

আলাগর মন্দির

মাদুরা হইতে ১৩ মাইল দূরে আমরা মোটর করিয়া আলাগর পর্ব্বতে গেলাম। ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে আলাগর বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। মন্দিরের দেবতার নাম সুন্দররাজ। তামিল ভাষায় আলাগর মানে সুন্দর, ঐ সুন্দররাজ হইতেই এখানকার পাহাড়টীর নাম আলাগর পর্ব্বত। এই পুর্ব্বত-তলে মন্দিরটী চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত হইয়া একটী বৃহৎ দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এককালে এখানে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এই মন্দির আক্রান্ত হইয়া ইহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল সেই ভয়ে এই উচ্চ প্রাচীর দিয়া মন্দিরটীকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। পাহাড়তলে মন্দিরের সংলগ্ন আম্রকানন ও পুষ্পোদ্যানে এবং উচ্চ তোরণদ্বার গোপুরমে মন্দিরের শ্রী বাড়িয়া গিয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন পর্ব্বত শিরে কিছুদূরে একটী ঝরণা আছে তাহার নাম 'নূপুর গঙ্গা'। তাহার পবিত্রজলে এখানে স্নান করিয়া পূত হইবার নিয়ম। মন্দিরটীর একটীই কল্যাণ মণ্ডপ। মীনাক্ষী

আলাগর মন্দির

(৮২ পৃষ্ঠা)
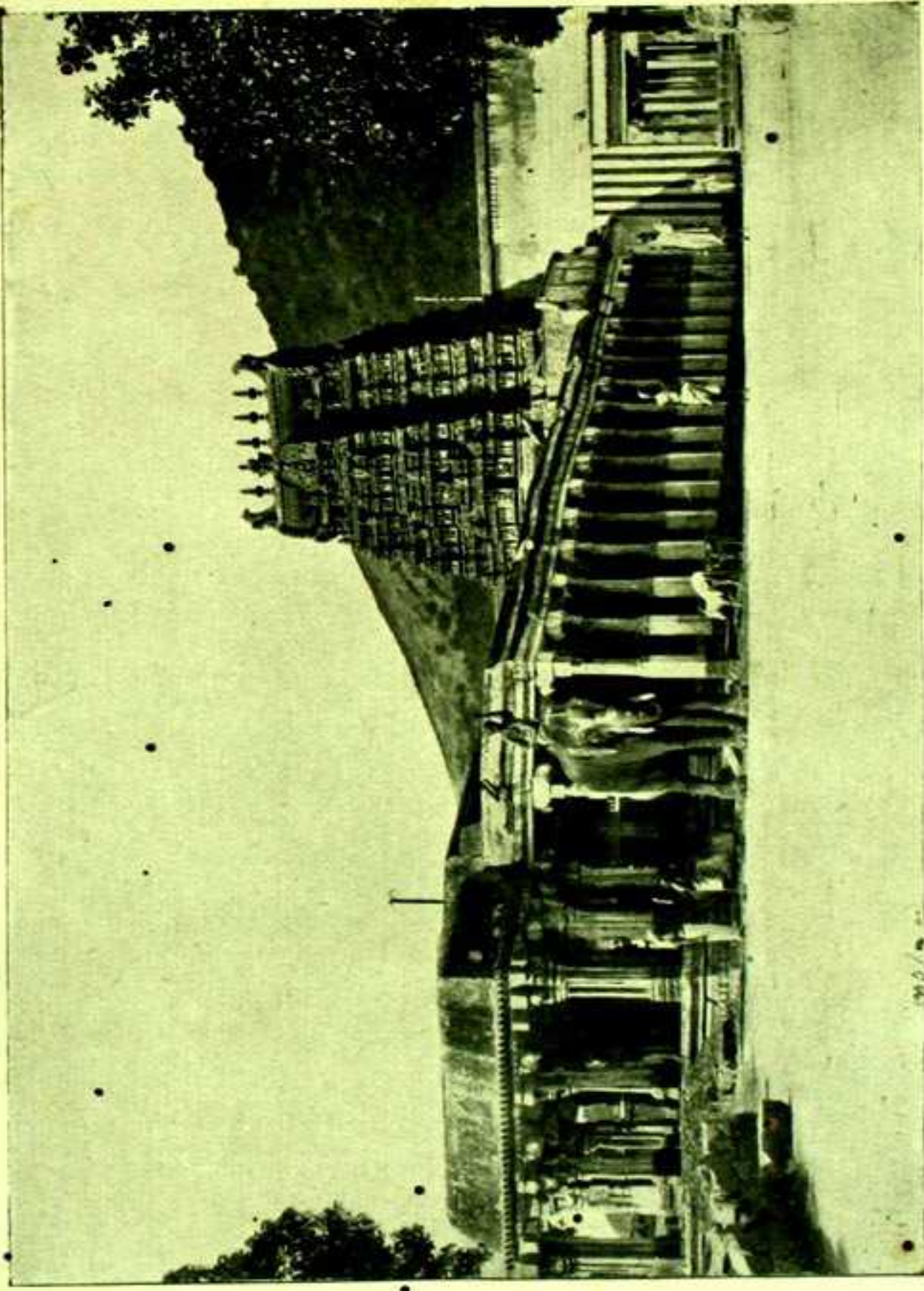
মন্দিরের মণ্ডপের ন্যায় ইহার মণ্ডপে কাল পাথরের স্তম্ভে বরাহ অবতার, ত্রিবিক্রম, বেণুগোপাল, গরুড়ের উপরে বিষ্ণু, নৃসিংহ অবতার, হনুমান প্রভৃতির বৃহৎ মূর্ত্তিসকল খোদিত। মন্দিরটীর বিশাল স্বর্ণ-মণ্ডিত বিমান নানা শিল্প-কার্য্যে দেখিতে খুবই জমকাল উজ্জ্বল। মন্দির দেবতা 'সুন্দর রাজ' সত্যসত্যই সুন্দর—কৃষ্ণপ্রস্তরের বৃহৎ মূর্ত্তি সমরসজ্জায় সুবর্ণ নির্ম্মিত পোষাক পরিয়া গদা তরবারী ধনুর্ব্বান ও শঙ্খচক্র লইয়া শোভমান সৌন্দর্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে সুবর্ণ নির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তি রহিয়াছে। ভিন্ন প্রকোষ্ঠে দেবী কল্যাণ সুন্দরবলী (সুন্দরওয়ালী) বিরাজ করিতেছেন। আমরা সুন্দররাজ এবং কল্যাণ সুন্দরবলীর মন্দিরে দর্শন পূজার্চ্চনা সারিয়া ও মন্দিরের একটী ভৈরব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মন্দিরের সুমহান স্বর্ণমণ্ডিত বিমান দেখিবার জন্য মন্দিরের ছাতে গিয়া উঠিলাম। ছাত হইতে বহুদূরে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের দু'টী প্রকাণ্ড গোপুরম্ দেখা যাইতে লাগিল। চারিদিকের পাহাড়ের ও সমতল ক্ষেতের দৃশ্য চিত্তাকর্ষক।

১৬৩২ খৃঃ অঃ রাজা তিরুমলনায়েক সুন্দররাজ দেবতার শয়ন করিবার জন্য আগাগোড়া হস্তিদন্তে নির্ম্মিত একখানি

শয়নকক্ষ বা ছাত দেওয়া সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উহা অনেকটা ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় মন্দিরের একস্থানে উহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—উহার কারুকার্য্য দেখিবার জিনিষ। মন্দিরে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত অনেক দ্রব্য একটি প্রকোষ্ঠে সংগৃহীত রহিয়াছে। হস্তিদন্তের দোলনা আলাগর মূর্ত্তি, নারায়ণ মূর্ত্তি, রতিমদন মূর্ত্তি, পরী মূর্ত্তি, সিংহমূর্ত্তি ইত্যাদি ইহার অনেকগুলি সুন্দররাজের উপরোক্ত শয়ন আসনে সংলগ্ন ছিল—ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখানে রাখা হইয়াছে। দুইটী অসাধারণ লম্বা ও মোটা-বৃহদাকার হাতীর দাঁতও রহিয়াছে দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক এমন কি ভারতবর্ষের বাহির হইতেও বহু বিদেশের লোক এই মন্দিরে দেবতা দর্শন করিতে আসেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দেবতার প্রণামীর মধ্যে যে সকল বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রাগুলি একটী মিউজিয়ম্ করিয়া মন্দিরে প্রদর্শনীরূপে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরে পুরাকাল হইতে যে সকল শঙ্খ ব্যবহৃত হইয়াছে ছোট বড় বহু পুরাতন শঙ্খ যাহা এখন অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে সেগুলিও সব একস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। মন্দিরের এই অভিনব প্রদর্শনী দেখিয়া আনন্দ পাওয়া গেল।

এখানকার আর একটি নিয়ম বড় ভাল লাগিল। এই পাহাড়তলীতে অধিকাংশই হিন্দুকৃষক। প্রত্যেক কৃষক তাহার ক্ষেতের উৎপন্ন দ্রব্য, ধান হোক গম হোক, ছোলা বা অন্য কিছু হোক, প্রত্যেক উৎপন্ন জিনিষ এক বস্তা করিয়া সুন্দর রাজদেবতাকে প্রণামী স্বরূপ দেয় এবং পুনরায় ক্ষেত বুনিবার সময় ঐ প্রদত্ত শস্য হইতে এক মুঠা করিয়া লইয়া তাহা বীজের সহিত মিশাইয়া ক্ষেত বুনানী করে। মন্দিরের একটি প্রশস্ত গৃহে এইরূপ ধান গম ইত্যাদির রাশিকৃত বহু বস্তা সজ্জিত রহিয়াছে। মন্দিরেও স্বর্ণ-মণ্ডিত ঘোড়া হাতী প্রভৃতি উৎসবের আসবাব সব রহিয়াছে। মীনাক্ষী দেবী এই মহাবিষ্ণুর ভগিনী সেই জন্য বৎসরে একবার করিয়া এই ১৩ মাইল পথ শোভাযাত্রা করিয়া সুন্দররাজ মাত্তরায় মীনাক্ষী মন্দিরে গিয়া থাকেন। পথে দেবতার বিশ্রামের জন্য মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট মণ্ডপ প্রস্তুত করা আছে—ফিরিবার সময় মাঠের মধ্যে সেগুলি দেখিতে বেশ ভাল লাগিতেছিল। আলাগর মন্দিরের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্থানটির নির্জ্জনতা মনের মধ্যে একটি ছাপ ফেলিয়া দেয়। ভেলোরের একজন এডভোকেট এই মন্দিরের ট্রাষ্টী আমাদিগকে এই মন্দির দেখাইলেন ও সব বুঝাইয়া দিলেন।

কালমেঘ প্রমাড় মন্দির

আলাগর যাইবার পথে দূর হইতে ঠিক হস্তী আকৃতিতে একটি পর্ব্বত দেখা যায় তাহার নাম Elephant Hill— হস্তী-পর্ব্বত। আলাগর হইতে ফিরিবার পথে আমরা ঐ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে কালমেঘ প্রমাড় বিষ্ণুমন্দির দেখিতে গেলাম। তামিলে প্রমাড় মানে বিষ্ণু। পাহাড়টির নিকটে আসিয়া দেখিলাম পাহাড়টির একটি প্রান্ত সত্যই হাতীর আকৃতির অনুরূপ—মাথা-মুখ-চোখ-শুঁড় লইয়া পর্ব্বত-প্রমাণ একটি হাতী বসিয়া আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায় ও দেখিয়া আশ্চর্য্যই হইতে হয়। পাহাড়টির সম্মুখে নরসিংহম্ বলিয়া ছোট গ্রাম—এইখানে মাঘ মাসে ঐ পাহাড়ের নীচে গজেন্দ্রমঠ বলিয়া একটি উৎসব হয়। একটু গিয়াই কালমেঘ প্রমাড়ের মন্দির—মন্দিরটি আড়ম্বরহীন খুব নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ও অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের আদর্শেই মন্দির নির্ম্মিত ও দেবতা প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির দেখিয়া মাদুরা ফিরিতে আমাদের অনেক বেলা হইয়া গেল।

মাত্বরা বস্ত্রশিল্পের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চিপুরম রেশমের কাপড় প্রস্তুত জন্য বিখ্যাত—মাত্বরা স্থতার স্থন্দর সাড়ি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। মাত্বরাকে বাংলার শান্তিপুর বলা যাইতে পারে। মাত্বরায় এক বড় দোকানে গিয়া আমরা কাঞ্চিপুরম বেনারস প্রভৃতি স্থানের বহু মূল্য সিল্কের সাড়ি এবং মাত্বরার প্রস্তুত নানা প্রকার রঙ্গীন সাড়ি ও সিল্কের সাড়ি কাপড় চাদর প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মাত্বরাতে বেতের প্রস্তুত নিত্য ব্যবহারের নানা শিল্প-কার্য্যের জিনিষ পাওয়া যায়। মাত্বরার রেলষ্টেশনে দ্বিতলে আরামপ্রদ স্থসজ্জিত বিশ্রামাগার আছে এবং ষ্টেশনের সন্নিকটে মঙ্গম্মল চৌলট্রীতেও থাকিবার স্থান পাওয়া যায়। বিকালে মাত্বরার রাস্তা ঘাট দোকানপাট সব দেখিয়া সন্ধ্যায় মন্দিরে গিয়া মীনাক্ষীর আরতি ও মন্দিরে দীপমালার আলো দেখিয়া আমরা মাত্বরা হইতে রাত্রি দেড়টার সময় ট্রেনে রামেশ্বর যাত্রা করিলাম।

রামেশ্বর

রামেশ্বর হিন্দুর চারিটি তীর্থধামের একটি প্রধান ধাম। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব্বদিকে বঙ্গ উপসাগর মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে পাম্বান বা পাক প্রণালী ও মান্নার উপসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ রূপে অবস্থিত। ইহা মাত্র ১২ মাইল লম্বা ও ৬ মাইল চওড়া। অযোধ্যার রাজপুত্র দেবাবতার রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে সীতা উদ্ধারকল্পে এই স্থান হইতেই পাকপ্রণালী সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করেন ও এই স্থানে রামনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রামেশ্বর হিন্দুর তীর্থ মহিমায় ও প্রাচীন ঐতিহাসিক গরিমায় চিরপ্রসিদ্ধ পূত পুণ্য ভূমি হইয়া আছে।

রামেশ্বর দ্বীপটি রামচন্দ্রের সেতুর সর্ব্বপ্রথম অংশ বলিয়াই মনে হয়। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট দ্বীপগুলি ও তাহার মধ্যস্থিত প্রণালী মধ্যে পর্ব্বত শিলার সাহায্য সুবিধা লইয়াই যে ঐ মনুষ্যসাধ্যাতীত বিরাট সেতু বন্ধন সম্ভবপর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাকপ্রণালীর উপর সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ব্রীজ

(৮৯ পৃষ্ঠা)
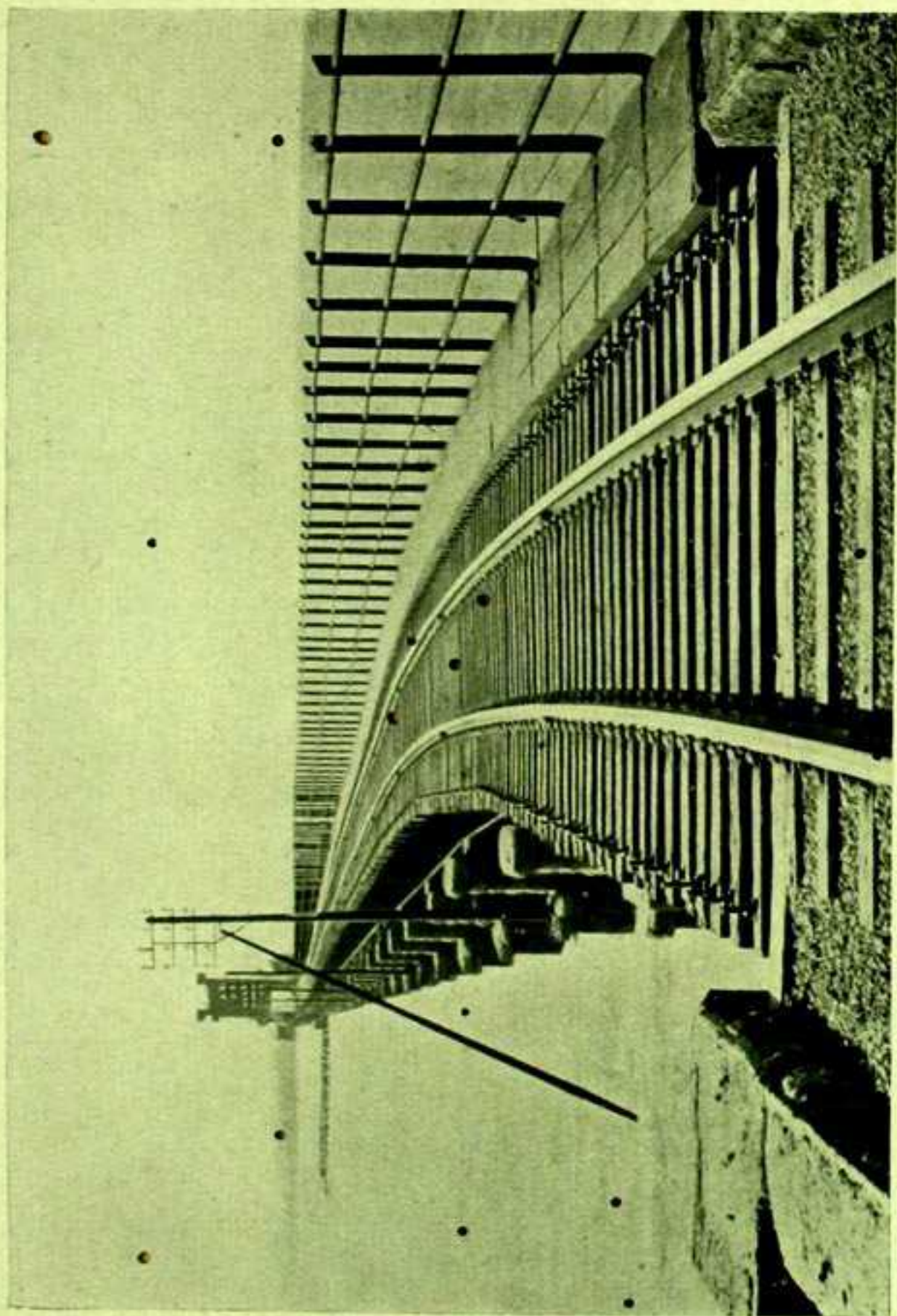
রামেশ্বর যাইতে গত ৩১শে ডিসেম্বর সকাল ৭টার সময় আমরা মণ্ডপম ষ্টেশনে পৌছিলাম। মণ্ডপম ষ্টেশনের সম্মুখেই সমুদ্র প্রণালীর জলরাশির ও তাহার কূলে কূলে বাংলো বাড়িগুলির দৃশ্য বড় ভাল লাগিল। মণ্ডপম ষ্টেশনের পর রামেশ্বর দ্বীপে পাম্বন ষ্টেশনে পৌছান অবধি দুধারে সমুদ্রের জলরাশির মধ্য দিয়া ট্রেন যাইতে থাকে এবং অবশেষে পাম্বান বা পাক প্রণালীর উপর দুই মাইলের উপর-দীর্ঘ ব্রীজ দ্বারা তাহা পার হইয়া পাম্বানে আসে। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের এই ব্রীজ রামচন্দ্র যেখানে সেতু বাঁধিয়াছিলেন সমুদ্র মধ্যে সেই সকল পর্ব্বত শিলার উপর দিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ব্রীজটির উপর ট্রেন উঠিবামাত্র যাত্রীদিগের অন্তর বিস্ময় ও পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়। মহা কৌতূহলে ট্রেনস্থিত প্রায় সকলেই ট্রেনের corridorএ দাঁড়াইয়া বা জানালায় মুখ বাহির করিয়া ব্রিজের নীচে ও দুই পার্শ্বে অপার জলরাশির তরঙ্গ কল্লোল ও প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিয়া আতঙ্কে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং ট্রেনটি ঐ ২।৩ মাইল ধরিয়া বিস্তৃত অশান্ত নীলাম্বুরাশি নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া আসিলে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। এই Roller Bridgeটির

মধ্যস্থলে খানিকটা স্থান এমন ভাবে প্রস্তুত যে তাহা খুলিয়া দেওয়া যায় এবং তাহাতে একদিক হইতে অন্যদিকে জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে।

পাম্বানে আসিয়া রেল দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া রামেশ্বর ও ধনুস্কোটিতে গিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিবার সময়ে জাহাজ হইতে নামিয়া এই পাম্বান দ্বীপে যেখানে প্রথম পদার্পণ করেন মহানুভব রামনদের রাজা পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের প্রথম পদার্পণের সেই স্থানটিতে তাহার স্মৃতিউদ্বোধক একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল প্রথমে ধনুস্কোটী যাইয়া বেলা ১১টার ট্রেনে রামেশ্বরে আসিব কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ট্রেন পাম্বান পৌছিতে দু'ঘণ্টা দেরী করায় তাহা হইল না। আমরা রামেশ্বর যাওয়াই স্থির করিলাম। পাম্বানের আগে হইতেই দেখিলাম রেলরাস্তার দু'ধারে কেবলি বাবলার গাছ—৫।৬ হাত উঁচুতে উঠিয়া মাথার ডালগুলি চারিদিকে গোলাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—একএকটি বিস্তৃত ছাতার মত তাহাদিগকে দেখাইতেছে। রামেশ্বর দ্বীপে শুধুই বালুকার স্তূপ এবং নারিকেল বাগান। সমুদ্রকূলের বাতাস

অহরহ এই বালি লইয়া খেলা করে ও তাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া লইয়া যায়—তাহাতে অনেক সময় রেলের লাইন বালির স্তূপে চাপা পড়ে এবং নূতন করিয়া লাইন প্রস্তুত করিতে হয়।

বেলা ৯টার সময় আমরা রামেশ্বর পৌছিলাম ও রেল-ষ্টেশন হইতে এক মাইল গিয়া মন্দিরের সন্নিকটে দেবস্থানের ছায়াকানন ঘেরা একটি সুন্দর বাংলোতে আশ্রয় লইলাম। সেখানে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া মন্দিরাভিমুখে বাহির হইয়া পড়িলাম। মন্দিরের পশ্চিমের গোপুরম দিয়া এক মাইল দূরে লক্ষণকুণ্ডতে যে রাস্তা গিয়াছে তাহাতে জাড্‌কা করিয়া লক্ষণকুণ্ডে লক্ষণেশ্বর শিবমন্দিরে আসিয়া পৌছিলাম। রামেশ্বর আসিয়া এই লক্ষণেশ্বর শিবের স্থানে উহার কুণ্ডে (বৃহৎ পুকুরে) স্নান করিয়া কুণ্ডের উপরেই মন্দিরের মণ্ডপতলে বসিয়া পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে হয়। কত দেশের কত নরনারী এই স্থানে স্নানান্তে পিতৃকার্য্য করিতেছে দেখিলাম। লক্ষণেশ্বর মন্দিরে শিবদর্শন ও পূজা সারিয়া আমরা পুনরায় আমাদিগের বাংলোতে ফিরিলাম ও মন্দিরের সন্নিকটে অগ্নিতীর্থে সমুদ্রস্নান করিতে গেলাম। এই

স্থানের সমুদ্রে স্নান করিতে কোন কষ্ট নাই—তরঙ্গের তেমন তাণ্ডবলীলা নাই—অনেকদূর অবধি সমুদ্রগর্ভে চলিয়া যাওয়া যায় এবং স্নান করিয়া খুব আরাম ও আনন্দই হয়। সীতা উদ্ধারের পর এই স্থানে সমুদ্রকূলে সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। সীতাদেবী এই স্থানে তাঁহার পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রমাণ করিতে অগ্নি প্রবেশ করিতে যান বলিয়া এই স্থানটির নাম অগ্নিতীর্থ। দিগন্তপ্রসারিত নীলাম্বুরাশির সম্মুখে এই বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া মানব দেহধারী দেবতার অসামান্যা সহধর্ম্মিণী হইয়াও যে "জনম-দুঃখিনী সেই মহীয়সী নারীর জীবনকাহিনী মনে পড়িয়া ভাবিলাম, হে দেব, যাহাকে উদ্ধার করিতে এই নীলাম্বুরাশি পার হইয়া জীবনমরণ সংগ্রামে অসাধ্য সাধনে দশানন কবল হইতে যে অমূল্য রত্ন ফিরাইয়া আনিলে তাহাকে কণ্ঠভূষণ না করিয়া কোন প্রাণে এই সমুদ্রকূলে অগ্নিশিখায় প্রবেশ করিতে দিলে ? তুমি ঈশ্বরাবতার, মানবের ক্ষুদ্র মনের ভাব চিন্তা যুক্তিতর্ক সকলের উপর ! কিন্তু তোমার চরিতগাথার মহাকবি এই বরনারীর যে নিষ্পাপ কলুষহীন চিত্র জগতের সমক্ষে ধরিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া সে আদর্শ জীবনের এই অগ্নি পরীক্ষায় ব্যথিত হইয়াই তোমার

প্রতি এই মনুষ্যোচিত প্রশ্ন ! সমুদ্রকূলে এই দ্বীপের উপর দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সুন্দর দ্বীপভূমিকে তুমি যে চির রমণীয় তীর্থস্থান করিয়া গিয়াছ তাহার জন্য তোমার চরণে অশেষ প্রণাম।

অগ্নিতীর্থে সমুদ্রস্নানের পর আমরা মন্দির দেখিতে গেলাম। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসকলের মধ্যে রামেশ্বরের মন্দিরটিও খুব বৃহৎ ও কারুকার্য্যময়। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এক ফার্লং দীর্ঘ ছাত দেওয়া বারান্দা পরিক্রমণের প্রশস্ত পথস্বরূপ মন্দিরটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের উপর এতবড় দীর্ঘ একটানা বারান্দা অন্যমন্দিরে দেখিতে পাই নাই। প্রথমেই মন্দিরের এই দীর্ঘ Corridoor পথ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই দীর্ঘ অলিন্দের উভয় পার্শ্বে একদিকে ৮৮টি আর এক দিকে ৮৪টি প্রস্তরের স্তম্ভশ্রেণি চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভগাত্রে ঐ একই প্রস্তর হইতে খোদিত একটি করিয়া বৃহৎ নারীমূর্ত্তি নতমুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে— স্তম্ভে স্তম্ভে এবং ছাততলে অন্য কারুকার্য্যও রহিয়াছে। মন্দিরটি পুরাতন হইলেও ইহার চারিদিকের এই পরিক্রমণের বারান্দা ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে রামনদের রাজাকর্ত্তৃক টিনিভেলি

প্রদেশ হইতে নৌকা করিয়া পাথর আনাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মূল মন্দিরটি বহু প্রাচীনকালে নির্ম্মিত। সমুদ্রের মধ্য হইতে পাথর আনাইয়া এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দির গাত্রের পাথর করাত দিয়া কাটা যায় এবং উহার মধ্য দিয়া বায়ু সঞ্চালন করিয়া থাকে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দীর্ঘ প্রকোষ্ঠ হইতে সমুদ্রের দৃশ্য পাওয়া যায়। পূর্ব্বপশ্চিমের বারান্দা উত্তর দক্ষিণের বারান্দা corridor হইতে দৈর্ঘ্যে কিছু কম। মন্দিরের পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে বৃহৎ উচ্চ গোপুরম দুটি অন্যান্য মন্দিরের ন্যায়ই কারুকার্য্যময় ও শীর্ষে সুবর্ণমণ্ডিত কলসী শোভিত। গোপুরম পার হইয়া দেবালয়ে যাইতে বারান্দার পথে সমুদ্রের শঙ্খ কড়ি রুদ্রাক্ষের মালা প্রভৃতির দোকান সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতার মন্দির সম্মুখে মণ্ডপে স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজাস্তম্ভ ও প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ বৃষমূর্ত্তি বসিয়া আছে।

কতকগুলি অন্ধকার কক্ষ পার হইয়া একটি দীর্ঘ বেদী ছাড়াইয়া রামনাথ শিবলিঙ্গ দেবতার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম ও তাঁহাকে দর্শন করিলাম। তাঁহার মন্দির দ্বার পিতলের প্রদীপে সজ্জিত। রুদ্রম্ অভিষেকং অভয়াভিষেকং অমৃতাভিষেকং প্রভৃতি তাঁহার নানারূপ অভিষেক

রামেশ্বরের মন্দির ও গোপুরম

(৯৪ পৃষ্ঠা)
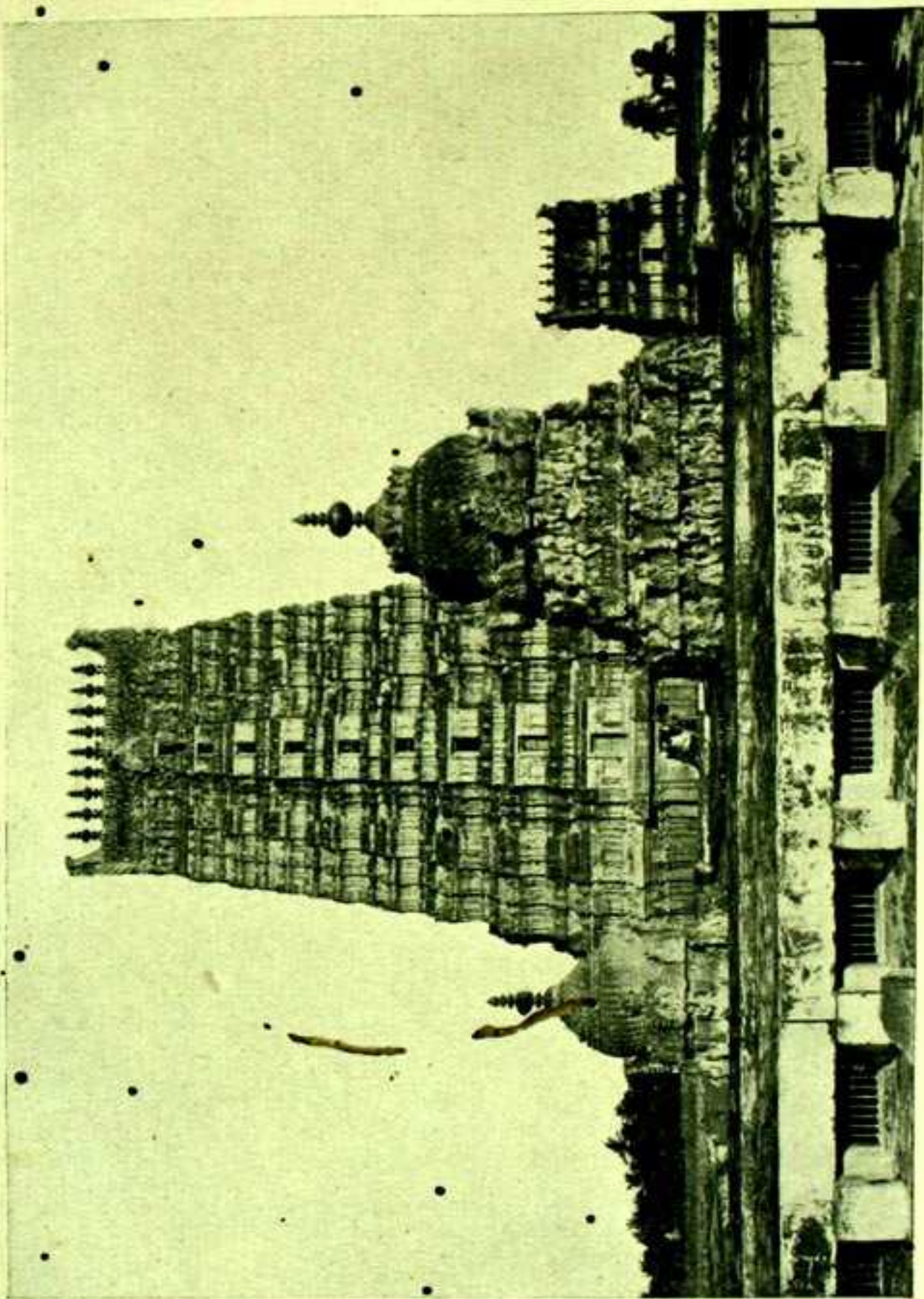
আছে। রুদ্রম অভিষেকং করাইতে ৫০৲ টাকা এবং অন্যান্য অভিষেক করাইতে তাহার নিম্নে যে টাকা লাগে তাহা মন্দির বাহিরে একটি নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে। অভিষেক জন্য মন্দির মধ্যে দু'টাকা করিয়া গঙ্গাজলের শিশিও কিনিতে পাওয়া যায়। রামনাথ শিবলিঙ্গকে কলসী কলসী জলে যে অভিষেক করা হইল ও অভিষেকান্তে তাঁহাকে চন্দন ফুলের মালা ও সুবর্ণ সর্পেরফণাতে যে সুন্দররূপে সাজাইয়া দেওয়া হইল তাহা দেখিতে বড় ভাল লাগিল। রামনাথের পার্শ্বে অন্য মন্দিরে পার্ব্বতীমূর্ত্তি রহিয়াছেন তাঁহার নাম পার্ব্বতীবর্দ্ধনী। এই দুই মূল দেবতা ব্যতীত এই মন্দিরে হনুমান আনীত কাশী বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া মন্দির হইতে ফিরিলাম।

রামেশ্বরে রামনাথ শিবস্থাপনা লইয়া দুইটি মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন রাম লঙ্কা হইতে ফিরিবার পর এইস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন—অন্য মতে রাম লঙ্কাতে যাইবার পূর্ব্বেই মহাদেবকে পূজা ও প্রসন্ন করিবার জন্য এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যে মতই সত্য হউক না কেন রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এই রামনাথ শিবলিঙ্গ ও বিশ্বনাথ

শিবলিঙ্গ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাহাই অদ্যাবধি পূজিত হইয়া আসিতেছে। এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রবাদটিও বড় সুন্দর। রামচন্দ্র এইস্থানে শিবপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য হনুমানকে কৈলাসপর্ব্বতে শিবলিঙ্গ আনিতে পাঠান। শিবলিঙ্গ লইয়া হনুমানের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় রামচন্দ্র এক বালির শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করেন। অতঃপর হনুমান শিব লইয়া আসিয়া বালির শিবলিঙ্গ দেখিয়া অভিমান করিলে রামচন্দ্র তাঁহার ভক্তকে ছলনা করিয়া বলেন—এখানে তোমার আনীত শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠা করিব তুমি এই বালির শিবলিঙ্গ তুলিয়া ফেল। বীর হনুমান প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহা তুলিতে পারিলেন না, তখন রামচন্দ্র হনুমানকে খুসী করিবার জন্য বলিলেন তোমার আনীত শিবলিঙ্গও এখানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং লোকে তাহা অগ্রে পূজা করিবে। হনুমানের আনীত ঐ শিবলিঙ্গই কাশীবিশ্বনাথ শিব। মন্দির মধ্যে কোটীতীর্থ বলিয়া একটি স্থান আছে। রামচন্দ্র শিবলিঙ্গকে গঙ্গাজলে অভিষেক করিবার জন্য তাঁহার ধনুর্ব্বাণে পৃথিবী ভেদ করেন এবং গঙ্গা তখন কোটীছিদ্র দ্বারা উপরে উঠিয়া জল প্রদান করেন—সেই স্থানই কোটীতীর্থ বলিয়া বিদিত।

রামেশ্বর রামনাদ রাজ্যের এক অংশ। রামেশ্বরের অধিপতি বলিয়া রামনাদের রাজাদিগের উপাধি হইতেছে সেতুপতি—ইহারা গুহক রাজার বংশ। লঙ্কা জয় করিবার পর তাঁহার বন্ধু এই গুহক রাজার নিকট রামচন্দ্র হনুমানকে পাঠাইয়া জয়সংবাদ দিয়াছিলেন। সেতুবন্ধ সময়ে রামচন্দ্র এই রামেশ্বর মন্দির হইতে প্রায় দু' মাইল দূরে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ছিলেন—সেখানে রামঝরূকা বলিয়া স্থান হইতে রামেশ্বর দ্বীপের ও চতুর্দ্দিকের সমুদ্রের বিস্তৃত দৃশ্য পাওয়া যায়। রামেশ্বর দ্বীপটির কোলাহলশূন্য নারিকেল বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন শান্ত নির্জ্জন ভাবটি বড় ভাল লাগিল। আমরা দেবস্থানের অতিথিভবনে উঠিলেও রামেশ্বরে যাত্রীদিগের বিনা ব্যয়ে থাকিবার জন্য অনেক ছত্র আছে এবং পাণ্ডাদিগের বাটীতেও উঠিতে পারা যায়। এখান হইতে এই দ্বীপের অন্যপ্রান্তে ধনুস্কোটী তীর্থ। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া যে পাপ করেন ধনুস্কোটীতে সমুদ্রস্নান করিয়া সে পাপমুক্ত হন—ধনুস্কোটীতে স্নান করিলে সকল পাপ মুক্ত হওয়া যায়। পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ মোচন করিবার জন্য এই ধনুস্কোটীতে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই জাহাজে

এখন লঙ্কাদ্বীপে যাইতে হয়। রাম এই স্থান দিয়াই লঙ্কা অবধি সেতু বাঁধিয়াছিলেন। লঙ্কা হইতে ফিরিয়া এই স্থানে রামচন্দ্র স্নান করিয়া চলিয়া আসিবার সময় সমুদ্র রামচন্দ্রকে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিতে বলিলে রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ ধনুক দিয়া স্থানে স্থানে সমুদ্রবক্ষের সেতু ভাঙ্গিয়া দেন তাই ধনুস্কোটী নাম। আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কুমারিকা ও ত্রিবাঙ্কুর দেখিয়া কলিকাতা ফিরিতে হইবেই তাই ধনুস্কোটীতে আর যাওয়া হইল না। রামেশ্বরে তালের পাতা দিয়া প্রস্তুত নানাপ্রকার রঙ্গীন পেতে, কৌটা, বাক্স ও শঙ্খের মালা ছোট বড় নানাপ্রকার শঙ্খ সমুদ্রের বিভিন্ন প্রকার কড়ি ইত্যাদি কিনিতে পাওয়া যায়। আমরা রামেশ্বর হইতে সন্ধ্যা ৬টার ট্রেনে পুনরায় মাদুরাতে রাত্রি ১১টায় ফিরিলাম ও কুমারিকা যাইবার জন্য মাদুরা হইতে ঐ রাত্রিতেই তিনিভেল্লী যাত্রা করিলাম—তিনিভেল্লী হইয়াই কুমারিকা যাইতে হয়।

তিনিভেল্লী

আমরা ১লা জানুয়ারী ১৯৪১ প্রাতঃকালে ৮টার সময় তিনিভেল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এই স্থানে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের ট্রাফিক স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট একজন বাঙ্গালী যুবক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস আমাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন ও এখানকার শিবমন্দির দেখাইতে লইয়া গেলেন। তিনিভেল্লী সহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত সোজা রাস্তা তাহার দু'ধারে উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী দোকান-পাট ও বাড়ী-ঘর এবং তাম্রপর্নী নদী ও তাহার উপর সেতু সহরটিকে সৌন্দর্য্য দান করিতেছে। ইহা তিনিভেল্লী জেলার সদর এবং এখানে একটী প্রথম শ্রেণীর হিন্দু কলেজ আছে। এখানকার যে মন্দির আমরা দেখিলাম তাহার নাম বেনুগণেশ্বর মন্দির। শ্রীচৈতন্যদেবের বেনুগণ কর্ত্তৃক দেবতা স্থাপিত বলিয়া ঐ নাম। মন্দিরটির সাতটি উচ্চ গোপুরম্ সহরের সদর রাস্তার উপর দণ্ডায়মান। গোপুরমের বৃহৎ দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের কতকগুলি মণ্ডপ অতিক্রম করিয়া বেনুগণেশ্বর শিবের মন্দিরদ্বারে যাইতে হয়।

সেখানে দেবতার মন্দির সম্মুখে এক প্রকোষ্ঠে পিতলের সুদীর্ঘ রেলিং-এর দুধারে দাঁড়াইয়া দেবতার পূজার্চ্চনা করা হইল। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পার্ব্বতীর নাম কান্তিমতী—প্রকৃতই দিব্যকান্তিতে ভূষিতা। তাঁহাকে দর্শন করিয়া এই মন্দিরস্থিত সুব্রহ্মণ্যদেবের মন্মথম্ মূর্ত্তি দেখিলাম। উজ্জ্বল রৌপ্যনির্ম্মিত ময়ূরের উপর সুবর্ণমণ্ডিত ষড়ানন মূর্ত্তি ৬টী মস্তক ও মুখে অপূর্ব্ব ভাব বিকাশে শোভা পাইতেছেন। দেবসেনাপতির এরূপ অভিনবমূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের আর কোন মন্দিরে দেখি নাই। চতুর্দ্দিকে দীর্ঘ বহিঃপ্রকোষ্ঠে মন্দিরটি বেষ্টিত। মন্দিরের মণ্ডপে সাতটি করিয়া সুগোল সরু প্রস্তর স্তম্ভ দিয়া এক একটি স্তম্ভ গঠিত ঐ স্তম্ভের প্রত্যেক সরু স্তম্ভটিতে সা, রে, গা, মা প্রভৃতি সপ্তস্বর বাঁধা—আরতির সময় প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে ঐ সুরের বাজনা হইত। স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য-শোভিত মণ্ডপটি দেখিবার মত। কান্তিমতী দেবীর মন্দির নিকটে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের স্বর্ণপদ্ম-সরোবরের ন্যায় বৃহৎ সরোবর। আমরা তাড়াতাড়ি এই মন্দির দেখিয়া তিনিভেল্লী হইতে বেলা ৯টার সময় মোটরে করিয়া ৫৫ মাইল দূরে কুমারিকা অন্তরীপে যাত্রা করিলাম ও বেলা ১২টার সময় তথায় পৌছিলাম।

কুমারিকার পথ
ও
তোতাদ্রিনাথের মন্দির

মান্দ্রাজ হইতে ত্রিভেন্দ্রম্ অবধি যে ৫২৮ মাইল লইয়া দীর্ঘ রাস্তা চলিয়াছে তিনিভেল্লী হইতে আমরা মোটরে প্রথমে সেই রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। তিনিভেল্লী সহর পার হইয়া এই রাস্তার দুধারে মাঠের পর মাঠ শুধু তাল বৃক্ষে ও বিস্তৃত জলাশয়ে পরিপূর্ণ। কোথাও একটি অন্য বৃক্ষ বা জঙ্গল নাই। জলের তীরে শুধু তাল বৃক্ষের বীথি চিত্রাঙ্কনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহা দেখিতে দেখিতে তিনিভেল্লী হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে আমরা শীঘ্রই নাঙ্গুনেরী নামক স্থানে আসিলাম ও সেখানে তোতাদ্রি-নাথের বিষ্ণু মন্দির দর্শন করিলাম। এইস্থানে লোমশমুনি দেবতাকে দর্শন পাইয়াছিলেন। মন্দিরে একটিমাত্র গোপুরম্। গোপুরমের সম্মুখে সাত ফুট প্রশস্ত একটি বৃহৎ খিলান দ্বার। সেখান হইতে সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরের

মধ্য দিয়া মন্দির অভ্যন্তরে যাইতে হয়। মন্দির দেবতার নাম তোতাদ্রিনাথ। তিনি স্বয়ং এইস্থানে ভূমি হইতে উঠিয়াছেন এই জন্য তাঁহাকে ভূমি-অবতার বলা হয়। মন্দিরে প্রধান দেবীমূর্ত্তির নাম শ্রীবরমঙ্গলা। এতদ্ব্যতীত শ্রীদেবী, ভূদেবী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, সূর্য্য, চন্দ্র, ভৃগু, মার্কণ্ডেয়, গরুড়, বিশ্বসেনা ও দেবনায়ক এই ১১টি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের ছাতবিশিষ্ট দীর্ঘ বারান্দায় বিপুল-কায় একটি জীবন্ত হাতী বাঁধা রহিয়াছে। বারান্দাটির প্রত্যেক পার্শ্বে ৪৫টি করিয়া প্রস্তরের স্তম্ভ। মন্দির মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায়ের একটি মঠ আছে। এখানে মন্দির দেবতার অভিষেক তিল তৈল দ্বারা হইয়া থাকে। তজ্জন্য মন্দিরে একটি তিল তৈলের কুণ্ড আছে। অভিষেকের ঐ তৈল মাখিলে শুনিলাম সর্ব্বব্যাধি ভাল হয়। মন্দিরদ্বারে একটি বাতগ্রস্ত বাঙ্গালীকে ভিক্ষা চাহিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট তাহার বাড়ী, সে এইস্থানে আসিয়া এই মন্দিরের তেল মাখিয়া অনেক উপকার পাইয়াছে।

অতঃপর আমরা মন্দির ছাড়িয়া নাগেরকইল রোড দিয়া কুমারিকা মুখে ধাবিত হইলাম। এই সুদীর্ঘ রাস্তাটি

পীচ দেওয়া না হইলেও খুবই সমতল, বারেকের তরেও মোটরে একটি ধাক্কা বা ঝাঁকুনী লাগিল না। একটানা বাতাস বহিয়া যাইতেছে, স্থানে স্থানে গৈরিক রঙ্গের জলরাশিতে মৃদু তরঙ্গ উঠিয়াছে—রাস্তার একদিকে সমতল মাঠ অন্যদিকে পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত শ্রেণী বরাবর উর্দ্ধে শির তুলিয়া অপূর্ব্ব গরিমায় দাঁড়াইয়া আছে। নাগেরকইল রোডের দুধারে একটানা বট বৃক্ষের সারি রাস্তাটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রাস্তাটির প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া দিব্য আরামে চলিয়া আসিলাম। মোটরে বসিয়া দেখিলাম তিনটি সাধু পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছে তাহাদেরই ভক্তি ও তীর্থ দর্শন সার্থক।

কুমারিকা হইতে ১৫ মাইল আগে আমরা নাগের-কইল রোড ছাড়িয়া পানাকুটি কেপ রোড দিয়া চলিলাম—কিছুদূর আসিয়াই ইংরাজের তিনিভেল্লী জেলার সীমানা ছাড়াইয়া স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এই প্রবেশ স্থানে একটি শুল্ক গৃহ আছে এইস্থানে আমাদিগের সঙ্গে কর দেওয়ার দ্রব্যাদি নাই এরূপ একটি স্বীকারোক্তি করিতে হইল। আমরা কোথা হইতে আসিতেছি কোথায় যাইতেছি আমাদিগের গাড়ীর নম্বর সব জানাইতে হইল

ও বার আনা টোল দিতে হইল। এই স্থান হইতে কেপ মাত্র চার মাইল। রাস্তাটি ক্রমশঃই নীচের দিকে নামিতেছে এবং রাস্তার দুধার সতেজ ধানের ক্ষেতে শ্যামল হইয়া আছে। তাহার মাঝে মাঝে লবণ প্রস্তুত হইবার স্থান আছে। ঐ স্থানগুলিতে মাটির উঁচু আইল দেওয়ায় তাহা এক-একটি স্বল্পগভীর পুকুর মত হইয়া আছে তাহাতে পাম্প করিয়া সমুদ্রের জল আনিয়া ভরা হয়। ঐ জল এই সব স্থানে দাঁড়াইলেই তাহার লবণ তলায় থিতাইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে খুব সহজেই লবণ প্রস্তুত হয়।

অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা নাগেরকইল কেপ রোডে আসিয়া পড়িলাম। এই রাস্তাটি পীচ দেওয়া, রাস্তাটির দুধারে আমের বাগান ও বাড়ী-ঘর আসিয়া দেখা দিল। সুন্দর সমতল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ রাস্তাটি গড়াইয়া দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে—এই রাস্তার গড়ানে নামিতে না-নামিতেই রাস্তাটির কালোরংএ রং মিলাইয়া চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় সুনীল জলধির চোখের উপর অনন্ত তরঙ্গ রাশির সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দিল। আমরা কুমারিকায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রথমেই মন্দিরে গিয়া দেখিলাম

মন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাগর কূলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের যে মনোরম কেপহোটেল অবস্থিত আমরা তাহাতেই মহারাজার অতিথিরূপে গিয়া উঠিলাম। তাহার দ্বিতলের প্রত্যেক গৃহ ও বারান্দা হইতে সম্মুখে দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দৃশ্য প্রাণে অপার তৃপ্তি আনিয়া দিল—সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অসীমের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। আমরা এই কেপ হোটেলের নীচে সমুদ্র মধ্যে হোটেলের যে Bath pool আছে তাহাতেই স্নান করিলাম—এই স্নানের স্থানটি তিন বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে ১০০ শত ফুট হইবে প্রস্থেও ৫০।৬০ ফুট হইবে চারিদিকে প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত এবং তলাতেও প্রস্তর বাঁধান। ভিতরে নামিবার সিঁড়ি ও জলের নিকট ধরিবার rod আছে। Poolটি একদিকে ৫ফুট গভীর অপর দিকে ৮ফুট গভীর—সেইদিকে দু'টি সেতুর মুখ দিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ ও জল ভিতরে আসিতেছে। পুলটি স্নান করিবার পক্ষে অতীব নিরাপদ ও আরামদায়ক। পুলটির উপরেই কাপড় ছাড়িবার ঘর। স্নানান্তে উপরে আসিয়া যে ঘরে আহার করিতে বসিলাম সেখান হইতে সমুদ্রবক্ষে মেঘের ছায়া পড়িয়া তাহা কতদূর চলিয়া যাইতেছে আবার রৌদ্র ফুটিয়া তরঙ্গশীর্ষে

কত মণি মাণিক ছড়াইয়া দিতেছে—নীলাম্বুহৃদয়ে আলোছায়ার এই খেলা দেখিতে দেখিতে আমরা আনন্দে আহার শেষ করিলাম ও বিশ্রামান্তে বেলা ৪ টার সময় সব দেখিবার জন্য সমুদ্র কূলে হাঁটিয়া বাহির হইলাম।

কন্যাকুমারিকা

ভারত জননীর চরণ প্রান্তের শেষ ভূমিখণ্ড কুমারিকা নামে অভিহিত। দেবী পার্ব্বতী কুমারীকন্যারূপে এখানে আছেন বলিয়া ইহার নাম কন্যাকুমারিকা। এই স্থানে বঙ্গ উপসাগর ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের একত্রে সংযোগ হইয়াছে। এই সংযোগস্থলের উপরেই দেবী কুমারীর মন্দির দাঁড়াইয়া আছে। সাগরত্রয় একত্রিত হইয়া এই মন্দিরের শেষ ভাগে ভারতজননীর চরণ চুম্বন করিতেছে। তাহাদিগের এই সঙ্গমস্থল কুমারিকা ভারতের মহাতীর্থরূপে কত যুগযুগান্তর হইতে কত নরনারীর প্রাণে শান্তি দিয়া আসিতেছে।

জননী ভারতবর্ষ যে একদিন এই সুনীল জলধি হইতে উঠিয়া হিমালয়ের তুষারশুভ্র কিরীট মস্তকে পরিয়া সগর্ব্বে এই তিন সাগরের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়াছেন—এই অনন্ত অসীম নীলাম্বুরাশির কূলে জননীর এই পদপ্রান্তে দাঁড়াইলে তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই স্থান হইতে মনে সুদূর উত্তরে

ঊর্দ্ধে দেবতার আবাস হিমালয়ের দিকে যেন আপনি ছুটিয়া যায়। নগাধিরাজ কন্যা পার্ব্বতীকে সাগর মধ্যে এই শেষ-ভূমি খণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেন উত্তর হইতে দক্ষিণ সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি যোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখা হইয়াছে। যে মহাপ্রাণ মনীষী দেশপ্রেমের ও স্বধর্ম্মের এই বিরাট কল্পনা করিয়াছেন তাঁহার চরণে মাথা নত করিতে হয়। সমুদ্র হইতে নিরবচ্ছিন্ন বায়ুসঞ্চালন ও সমুদ্রবক্ষের তরঙ্গউচ্ছ্বাসকল্লোল স্থানটিকে অনন্ত শব্দ-মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে—প্রকৃতির বিশাল মুক্ত মন্দিরে সৃষ্টি দেবতার স্তবগানে যেন অহরহ ওঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বিশ্বসৃষ্টি যে এক মহান অপূর্ব্ব সঙ্গীতে পরিপূর্ণ তাহা হিমালয় শীর্ষে গগনস্পর্শী পাইন বনেও যেমন বুঝিতে পারা যায় এই অসীম বিশাল নীলাম্বুকূলে সে রচিত গান যেন আরো নিবিড় ভাবে অন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। উপরে অনন্ত আকাশ সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র প্রকৃতির এই দুই মহান রূপ প্রকাশের ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি মধ্যে দাঁড়াইলে নীরব অন্তকরণ বিশ্বস্রষ্টার চরণে আপনি আত্ম-নিবেদন করিতে থাকে।

মায়ের মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে আমরা সমুদ্রকূলে

কুমারিকার সমুদ্র উপকূল

(১০৯ পৃষ্ঠা)
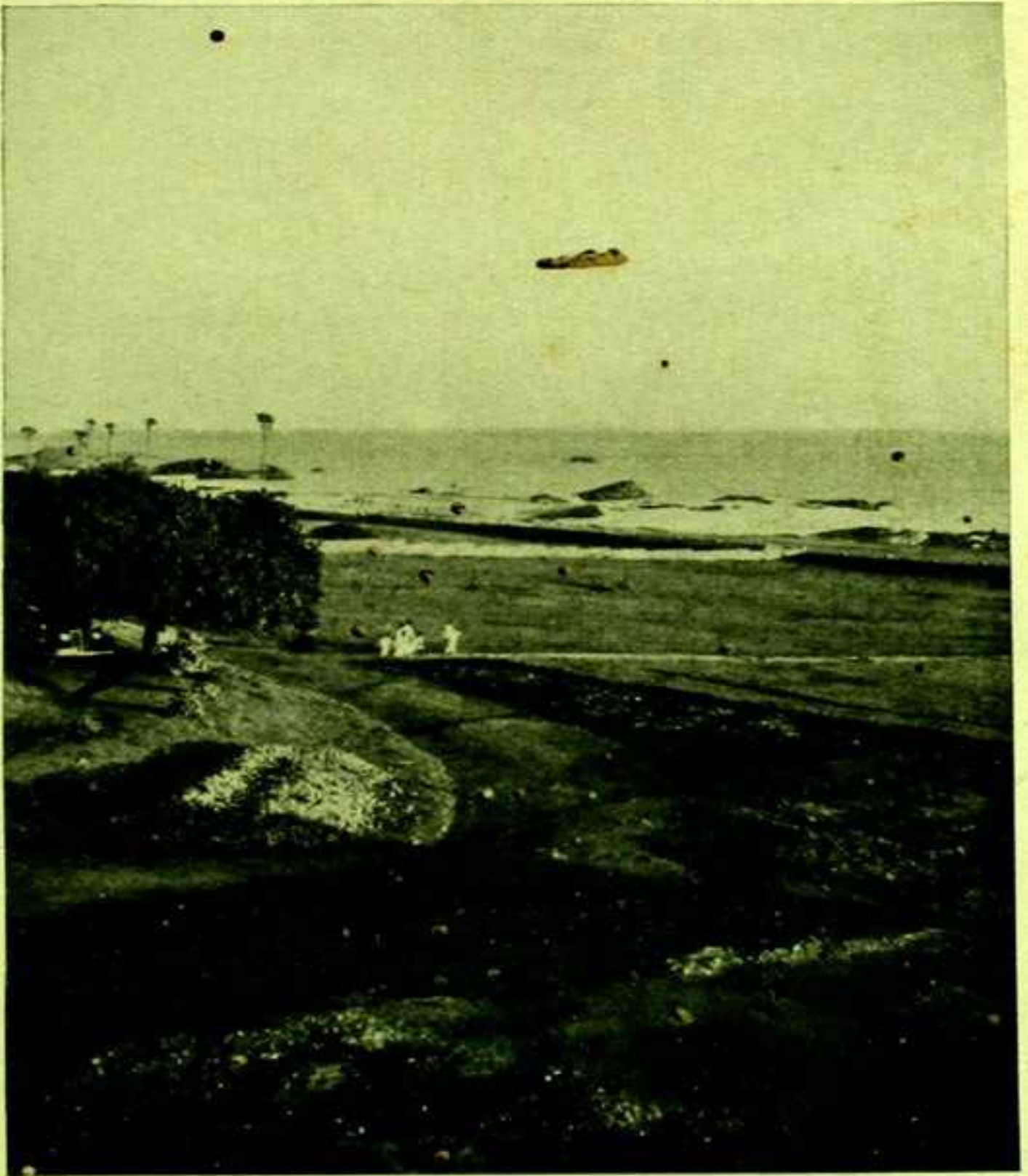
বেড়াইলাম ও সমুদ্রমধ্যে যে স্থানে জননী ভারতবর্ষের শেষ স্থলবিন্দু সেখানে গিয়া একবার দাঁড়াইলাম। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একজন উচ্চকর্ম্মচারী আমাদিগকে ঐস্থানে লইয়া গেলেন। ভারতবর্ষের মানচিত্রে তাহার দক্ষিণাংশ যেরূপ অঙ্কিত অবিকল সেই ত্রিকোণ আকারেই তাম্রবর্ণের বালুকাময় এই স্থানটিকে বেশ বোঝা যাইতেছে। এই স্থানটির নিকটে তিনদিকেই সমুদ্রমধ্যে অনেক পাথর মাথা তুলিয়া আছে। পূর্ব্বে বঙ্গ উপসাগর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আরবসাগর তিনদিক হইতে এই তিন সাগরের তরঙ্গ আসিয়া এইস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা মিশিয়া যাইতেছে না। এই স্থানটি সম্বন্ধে পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম where waters meet but never mingle—তাহা সুন্দর প্রত্যক্ষ করিলাম। এই স্থানে দাঁড়াইয়া যখন তিনদিক হইতে তিনটি ঢেউ একসঙ্গে আসিয়া পড়িল অমনি তাহাদিগের জল হাতে তুলিয়া মাথায় লইলাম। দক্ষিণে সমুদ্রমধ্যে একপা আগাইয়া গিয়া মনে করিলাম এইতো ভারতের বাহিরে আসিয়াছি! সেই স্থানে সমুদ্রগর্ভে একটি পাথরের উপর দাঁড়াইয়া জননী ভারতবর্ষের পদপ্রান্ত প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ

করিলাম। মহাকবি তালতমালসমাকীর্ণ সমুদ্রকূলকে বর্ণনা করিয়াছেন "আভাতি বেলা বনরাজিনীলা!" দূরে সমুদ্র মধ্য হইতে তাহা দেখিবার সুযোগ না হইলেও উপরে কূলে কূলে শ্যামল তাল বৃক্ষ শ্রেণী ও অন্য বনরাজি যে কত সুন্দর দেখাইতেছিল কত উৎসাহের সঙ্গে তাহা এই স্থান হইতে দেখিলাম। এস্থান হইতে ৩০।৪০ হাত পূর্ব্বদিকে কন্যাকুমারীর মন্দিরপ্রাচীরের দক্ষিণে সাগরসঙ্গমে স্নানের ঘাট—এইস্থানেই যাত্রীরা স্নান করিয়া থাকেন। ঘাট হইতে উঠিয়াই উপরে একটি স্তম্ভযুক্ত খোলা নাটমন্দির। ঘাটটি আগাগোড়া পাথর বাঁধান ও পাথরের সিঁড়ি এবং জলমধ্যে চারিদিকে লোহার রেলিং ঘেরা। এই ঘাটে সমুদ্র স্নানে কোন কষ্ট বা বিপদের আশঙ্কা নাই। ঘাটের অনতিদূরেই সমুদ্র মধ্যে চারিধারেই পর্ব্বত শিলা রহিয়াছে—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গগুলি তাহাতে প্রতিহত হওয়ায় স্নানের স্থানটিতে তাহাদের প্রবল ধাক্কা বিশেষ লাগিতেছে না। উপরে উঠিয়া পূর্ব্বদিকে একটি কাপড় ছাড়িবার ঘর আছে সেখান হইতে সমুদ্র বক্ষের দৃশ্য বড় সুন্দর। সমুদ্রবক্ষে দক্ষিণে অনেকদূর লইয়া দ্বীপাকারে অনেক পাহাড় দেখা যাইতেছে—তাহার গায়ে সমুদ্রতরঙ্গ তোলপাড় করিয়া আছাড়

খাইতেছে ও তাহাদের জল শুভ্র বিন্দুরাশিতে কেবলই ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। তীর হইতে একটু দূরে এইস্থানে সমুদ্র মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর স্বামী বিবেকানন্দ যোগাসনে ধ্যান নিমগ্ন থাকিতেন। এইস্থানে সমুদ্র মধ্যে আর একটি বড় পাহাড়ের অভ্যন্তরে পরিষ্কার পানীয় জল রহিয়াছে। এইস্থান হইতে সমুদ্রবক্ষে ভাস্বর ~~জগৎ~~ সবিতার উদয় ও অস্ত বিশেষ দেখিবার জিনিষ। আমরা সূর্য্যাস্ত দেখিবার জন্য কত আগ্রহ লইয়া সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া রহিলাম কিন্তু ঐ সময় খুবই অনাবশ্যক ভাবে দুএকখানি শুভ্র পাতলা মেঘ আসিয়া অস্তাচল ঢাকিয়া দিল। সূর্যদেব তাহার আড়ালে দিকচক্রের নীচে নামিয়া পড়িলে তাঁহার তেজপুঞ্জের রক্তিমচ্ছটায় পশ্চিমের আকাশখানি ভাসিয়া গিয়া সাগর বক্ষে তাহার দীপ্তি ছড়াইয়া দিল ও আমাদিগের সূর্য্যাস্ত দেখিবার আকাঙ্ক্ষার কতক ক্ষতিপূরণ করিল।

অতঃপর আমরা সন্ধ্যারতি দেখিতে মায়ের মন্দিরে গিয়া উঠিলাম। দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রই যে দেব মন্দির দেখিয়া আসিলাম কন্যাকুমারীর মন্দির তাঁহার তুলনায় ছোট ও কারুকার্য্যহীন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক হইতে মন্দিরটির যে সুন্দর অবস্থিতি তাহাতে এই মন্দিরের

চারিদিকে চারিটি গগনস্পর্শী গোপুরম্ থাকিলে অন্ততঃ একটি থাকিলেও সাগরবক্ষে বহুদূর হইতে তাহার সুমহান সৌন্দর্য্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দুঃখের বিষয় মন্দিরে একটিও গোপুরম্ না থাকায় ইহার বাহ্য দৃশ্য তেমন জমকাল নহে। কাঞ্চিপুরমে শ্রীরঙ্গমে মাদুরায় স্থাপত্য শিল্পের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসিলাম—এখানে আসিয়া তাহার আরও উৎকর্ষ দেখিব কি মন্দিরের কারুশিল্পের বিশেষ অভাব ও অবনতিই লক্ষিত হইল। ইহার উত্তর দিকে প্রবেশ দ্বারে দুইটি অনতিউচ্চ কারুকার্য্যহীন চতুষ্কোন প্রস্তরস্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত হইয়া মন্দিরটি আপন আড়ম্বরহীন শ্রীতে শোভা পাইতেছে। বঙ্গোপসাগরের উপর ইহার পূর্ব্বদিকের দুয়ারটিই প্রধান। অধুনা তাহা বৎসরে ছয়বার মাত্র খোলা হইয়া থাকে। বৃহৎ সুপ্রশস্ত ওই দুয়ার দিয়া মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বিশাল সমুদ্র বক্ষের দৃশ্য পাওয়া যায়। দেবী কুমারী মূর্ত্তি সমুদ্রের এই সঙ্গমস্থলে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে চাহিয়া আছেন তাহাতে মনে গৌরব অনুভব করিলাম। মনে হইল দেবী যেন আমাদের বঙ্গভূমির দিকেই দৃষ্টি করিতেছেন। মায়ের কুমারী মূর্ত্তি দেখিয়াও খুব প্রীত

হইলাম—কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর ভাবময় মূর্ত্তি। মীনাক্ষী দেবীর ন্যায় কুমারী পার্ব্বতীও দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ সময় মুখখানি সম্পূর্ণ চন্দন চর্চ্চিত থাকায় দেবীকে ধাতুময় মূর্ত্তি বলিয়া ভুল হইয়াছিল। কণ্ঠে বহু ফুলমালা শোভিতেছে, দক্ষিণ হস্তে তুলসীর মালা জড়ান রহিয়াছে বাম হস্ত জপ করিবার মত কর ধরিয়া আছে। মায়ের ললাটে নাসিকায় এবং ওষ্ঠের অধোভাগে চিবুকে তিন খানি হীরক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। পূর্ব্বে মায়ের অঙ্গে একখানি নাগরত্নমণি থাকিত যাহার জ্যোতি এই মন্দিরাভ্যন্তর হইতে সম্মুখে সমুদ্র বক্ষে ১২ মাইল অবধি প্রসারিত হইত। জলদস্যু কর্ত্তৃক অপহরণের ভয়ে এই রত্নখানি এখন খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মায়ের ললাটের উজ্জ্বল হীরক নিঃসৃত জ্যোতি মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দুয়ার দিয়া সমুদ্রবক্ষে বিকীর্ণ হইয়া পড়ায় একবার একখানি জাহাজ মন্দিরটিকে সমুদ্রের আলোকগৃহ অনুমান করিয়া তীরে আসিতে সমুদ্র-গর্ভের পর্ব্বত শৈলে আঘাত লাগিয়া ডুবিয়া যায়। এখানকার মৎস্যজীবি খৃষ্টিয়ান মালোগণ মন্দির হইতে দেড়মাইল দূরে তাহাদিগের গির্জ্জাঘরে পতাকা তুলিবার দণ্ড স্বরূপ ঐ জাহাজের মাস্তুলটি রাখিয়া দিয়াছে। এই দুর্ঘটনার পর

হইতে সমুদ্রের উপর মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দুয়ার এখন বন্ধ করিয়া রাখা হয়। প্রদীপ এবং কর্পূরের আলোকে মায়ের আরতি মনোমুগ্ধকর। আমরা রাত্রি ৯ টার সময় পুনরায় মন্দিরে গিয়া দেবীর শয়ন আরতি দেখিলাম। ঐ সময় দেবীর সম্মুখে প্রদীপের আলোকে একজন দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে বসিয়া

"বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে বানলে পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে
অরণ্যে শ্মশানে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে—"

বলিয়া যে স্তব করিতেছিলেন সমুদ্রকূলে সুদূর প্রবাসে দেবীর নির্জ্জন মন্দিরে সে ঐকান্তিক প্রার্থনা প্রাণস্পর্শ করিতেছিল। দেবীর শয়নকালে মন্দিরে সুন্দর সানাই বাজিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের অন্য মন্দিরেও মধুর বাজনা শুনিয়াছি কিন্তু এখানকার এই শয়ন আরতির বাজনার মধ্যে একটু নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য্য বোধ হইতেছিল।

এই স্থানে কন্যাকুমারীর জন্ম ও আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে বাণাসুর এবং মুকাসুর এই স্থানে আধিপত্য

করিতে আরম্ভ করে—তাহাতে দেবতারা বিপদাপন্ন হন। বাণাসুর মহাদেবের নিকট হইতে এই বর পান যে তিনি কোন পুরুষের বধ্য হইবেন না। বাণাসুরের অত্যাচারে ইন্দ্র মহাদেব ও পার্ব্বতীর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। এই কুমারিকা হইতে ৮ মাইল উত্তরে শুচীন্দ্রম গ্রামে ইন্দ্র হোম ও তপস্যা করেন। পরাশক্তি পার্ব্বতী ইন্দ্রের ঐ হোমাগ্নি হইতে এক অপরূপ কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। ঐ কন্যা সাত বৎসর বয়সে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাণাসুর ও মুকাসুরকে নিহত করেন। এই কন্যা মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার তপস্যা করিলে মহাদেব এই কুমারীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। কিন্তু দেবী যে কুমারী জীবনের প্রভাবে ও শক্তিতে অসুর নিধন করিয়াছিলেন বিবাহে সে কৌমারশক্তির অন্তর্দ্ধান হইয়া যাইবে সেইজন্য দেবতারা দেবীর বিবাহ সংঘটন হইতে দেন নাই। বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির হইল। ঐ দিন ঐ লগ্নে বিবাহ না হইলে আর বিবাহ হইবে না তাহাও স্থির হইল। পার্ব্বতী অপার উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন—মহাদেবও বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ করিতে বাহির হইয়াছেন কিন্তু আসিতে পথে নারদের

চক্রান্তে দুর্ব্বাসার সহিত কথাবার্ত্তাতে লগ্নভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ায় আর বিবাহ হইল না—দেবী কুমারী অবস্থাতেই এই স্থানে থাকিয়া গেলেন। বিবাহের ভোজের জন্য যে প্রভূত অন্ন রান্না হইয়াছিল তাহা এই সমুদ্রকূলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ ছড়ান অন্ন এই সমুদ্রকূলে বালিতে পরিণত হয় তাই এখানকার বালিগুলি দেখিতে আকারে একটু দীর্ঘ। ঐ বালিকে এখানে চাউল বলিয়া থাকে। ছুহুয়ার মেয়েরা এখানে শামুক ঝিনুক কড়ি শঙ্খের মালা এবং ছোট ছোট চুপড়ী করিয়া ঐ বালিকে চাউল বলিয়া বিক্রয় করে। কুমারী পার্ব্বতীর বাণাসুরের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং যাহাতে বাণাসুর-বধ হইয়াছিল তাহার স্মরণার্থ প্রত্যেক মালয়লম্-বৎসরের দ্বিতীয় মাসে এখানে অম্বুচর্তু অর্থাৎ ধনুর্যুদ্ধ বলিয়া একটি উৎসব হইয়া থাকে।

এই স্থানে কেপ হোটেল ব্যতীত ত্রিবাঙ্কুরের গভর্ণমেণ্ট হাউস অর্থাৎ সমুদ্রকূলে আসিয়া মহারাজার থাকিবার প্রাসাদখানি মন্দিরের কিছু পশ্চিমে বেলাভূমির উপর বড় রমণীয় ভাবে অবস্থিত। সমুদ্রকূলে রাজষ্টেটের আরও একখানি অতিথিভবন আছে। যাত্রীদিগের জন্য আরো দুটী চৌলট্রি আছে। এখানে যে রামকৃষ্ণ মিশন

আছে তাহার ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আমরা দেখিলাম। কুমারিকার দুই সহস্র লোক সংখ্যার মধ্যে দুই শত মাত্র হিন্দু অবশিষ্ট সবই খ্রিষ্টিয়ান জানিয়া দুঃখিত হইলাম। কুমারিকা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাস ও সমুদ্র স্নানের সুন্দর স্থান। ইহার নিকটে একটি পুরাতন দুর্গ আছে—ত্রিবাঙ্কুররাজ একজন ডাচ সেনাধ্যক্ষকে সেখানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর হইতে এখানে মোটরবাস্ যাতায়াত করে।

আমরা পরদিন সকাল ৬টার সময় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মন্দিরের নীচে সঙ্গমঘাটে সমুদ্রস্নান করিলাম। এই ঘাটের নাম মাতৃতীর্থ। এই স্থানে অন্থদয়ে স্নান করিতে হয়। পরশুরাম এইস্থানে স্নান করিয়া মাতৃহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হন—তাই এই তীর্থস্নানে সকল পাপ মোচন হয়। স্নানান্তে দেবী কুমারীকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া কেপ্ হোটেলে ফিরিলাম। সেখানে সমুদ্রবক্ষে নবোদিত সূর্য্যালোক ও বহুদূরব্যাপী তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মাছধরা নৌকাগুলির সাদাপাল দেখিতে দেখিতে কফি ও প্রাতঃকালীন ভোজন শেষ করিয়া আমরা ৮৷৷০ টার সময় মোটর করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিভেন্দ্রম্ যাত্রা করিলাম।

শুচীন্দ্রম

কুমারিকা হইতে ৫৪ মাইল্ দূরে নাগেরকইল রোড দিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিভেন্দ্রম্ আসিতে হয়। এই রাস্তায় উঠিতে না উঠিতে কুমারিকার নিম্নভূমি হইতেই সম্মুখে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নত শিখরের সুনীল সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারিকা হইতে ৮ মাইল দূরে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা শীঘ্রই শুচীন্দ্রম গ্রামে আসিয়া পড়িলাম। এখানে একটী বৃহৎ পুরাতন মন্দির আছে—তাহাতে সুন্দরেশ্বর শিব ও বিষ্ণুর উভয় মূর্ত্তি এবং রামসীতার মূর্ত্তিও রহিয়াছে। মন্দিরটির বৃহৎ গোপুরম এবং চারিদিকে সুদীর্ঘ ছাদদেওয়া বারান্দার প্রদক্ষিণ পথ আছে। এই দীর্ঘ বারান্দার প্রতি স্তম্ভে যে সব বড় প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে তাহার সবগুলিই প্রায় ভগ্ন দেখিলাম। কোনটির হাত কোনটির পা কোনটির নাক মুখ বা কোনটির অন্য অঙ্গ ভাঙ্গা রহিয়াছে। শুনিলাম ১৬৮০ খৃঃ অব্দে মুকীলন মুসলমান আক্রমণকারিগণ কর্ত্তৃক মন্দিরটির এই

শ্রীহানি হইয়াছে। এই দীর্ঘ বারান্দার এক প্রান্তে একটি ছোট শিবলিঙ্গ এবং তাহার সম্মুখের প্রস্তর মূর্ত্তিটি অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। শিবলিঙ্গটি সম্ভবত মুসলমানদিগের মাথার টুপীর ন্যায় দেখিতে বলিয়া তাহাকে না ভাঙ্গিয়া আক্রমণ-কারিগণ ইহার সম্মুখের প্রস্তর মূর্ত্তির হাতে একটি প্রদীপ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিল—ঐ প্রদীপটি ঐ মূর্ত্তির হাতে শিবলিঙ্গের সম্মুখে এখনও রহিয়াছে। এই মন্দিরে একটি দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের এক প্রান্তে একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত ২০ ফুট দীর্ঘ একটি বৃহৎ হনুমান মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার সম্মুখে ঐ প্রকোষ্ঠের অপর প্রান্তে রামসীতার মূর্ত্তি অবস্থিত। মন্দিরটির মণ্ডপে সপ্তস্বর বিশিষ্ট সাতটি করিয়া সরু গোল স্তম্ভ দিয়া নির্ম্মিত এক একটি বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ আছে—আঘাতে তাহা হইতে সঙ্গীতধ্বনি নিঃসৃত হইতে থাকে। এই মন্দিরের শিবকে যে বৃক্ষতলে পাওয়া গিয়াছিল ঐ বৃক্ষটিকে মন্দির মধ্যে রক্ষা করা হইয়াছে। এই শুচীন্দ্রম স্থানটির নামের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও পৌরাণিক। বহু পুরাকালে এই স্থান গভীর অরণ্যে পূর্ণ ছিল—ঐ অরণ্যের নাম ছিল জ্ঞানারণ্য। মহর্ষি অত্রি এবং সতী অনসূয়া এই অরণ্যে বাস করিতেন। আমরা

উত্তর ভারতে চিত্রকূট গিয়া সেখানকার বিন্ধ্যপর্ব্বতে এই অত্রিমুনি ও তাঁহার পত্নী অনসূয়ার থাকার কথা এবং রামচন্দ্র সীতাসহ বনবাসে আসিতে তাঁহাদিগের আশ্রমে যাওয়ার কথা শুনিয়াছিলাম। যাই হোক এখানকার পৌরাণিক কাহিনীতে পুরাকালে ঐ অত্রিমুনি ও অনসূয়া সতী এই শুচীন্দ্রমের জ্ঞানারণ্যের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা হয়তো বিন্ধ্যপর্ব্বতেও যাইয়া থাকিবেন। এই অরণ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় মহর্ষি অত্রি যোগ আরম্ভ করেন ও দেবতার তপস্যায় হিমালয় অবধি যান। ঐ সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিমূর্ত্তি অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া কি করিয়া তাঁহাদিগকে তিনটি শিশুর রূপ ধরিতে হইয়াছিল—এই স্থানের কাহিনীতে সে সব এমন অনেক কথা আছে। গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যার প্রতি দেবরাজ ইন্দ্র আসক্ত হইয়া অহল্যার নিকট গমন করায় গৌতমের অভিসম্পাতে তাঁহাকে যে ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল এবং রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে উদ্ধার না হওয়া অবধি অহল্যাকেও যে পাষাণ হইয়া যাইতে হইয়াছিল একথা সকলেই জানেন। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের ঐ অভিসম্পাতের পাপ ফল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এইখান-

কার এই জ্ঞানারণ্যে যোগ তপ করিয়া শুদ্ধ হন ও এইস্থানে শুচিতা লাভ করেন বলিয়া এই স্থানের নাম শুচীন্দ্রম্। এই স্থানের সন্নিকটে ইন্দ্র যে পর্ব্বতোপরি বৃহস্পতির সাক্ষাৎ পান ঐ পর্ব্বতের নাম মারুতুভ মালাই। উহা পূর্ব্বঘাট শৈলশ্রেণীর শেসাংশে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত। মলয়ানিলের আশ্রয় স্থল বলিয়াই বোধ হয় উহার ঐ নাম। কুমারিকাতে বাণাসুর বধের জন্যও ইন্দ্র এই শুচীন্দ্রমে তপস্যা ও হোম করিয়াছিলেন—এই স্থানেই তাঁহার হোমাগ্নি হইতে কুমারীর উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যের পৌরাণিক ইতিহাসে শুচীন্দ্রম মহাপবিত্র স্থান। এই স্থানে প্রজ্ঞাতীর্থ নদী প্রবাহিতা।

ত্রিবাঙ্কুর

শুচীন্দ্রনাথ শিব-মন্দির দর্শন করিবার পর ত্রিভেন্দ্রমের পথে যাইতে কত সুন্দর সুন্দর সহর গ্রাম ও অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। রাস্তার ধার দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা বিরাট সৌন্দর্য্যে মাথা তুলিয়া আছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। পশ্চিমে আরব সাগর পূর্ব্বদিকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী এই উভয়ের মধ্যে ইহা অবস্থিত। উত্তরাংশে আরব সাগর হইতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর ব্যবধান ৭৫ মাইল মাত্র। কুমারিকা হইতে ত্রিভেন্দ্রম আসিতে রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত জলপূর্ণ হ্রদ, টুকটুকে লাল মাটি, তাহার উপর শস্যপূর্ণ সবুজ ক্ষেত, ঘন নারিকেল বৃক্ষের কুঞ্জ, পাহাড় এবং শ্যামল প্রান্তরভূমি অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্যে ও লক্ষ্মীশ্রীতে দেশটিকে অদ্বিতীয় করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার সহর গ্রামগুলি প্রায়ই রাস্তার দুধারে অবস্থিত। কোট্টার বলিয়া একখানি

বড় গ্রামের মধ্য দিয়া শীঘ্রই আমরা একটি সুদৃশ্য clock tower (ঘড়িঘরের) নিকট আসিলাম। সেখান হইতে নাগের-কইল সহর আরম্ভ হইল। খৃষ্টান মিশনারীদিগের কলেজ ও সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘরে ও কংক্রীট করা রাস্তাতে সহরটির দৃশ্য মনোরম্। ইহার পরই ত্রিভেন্দ্রম্ হইতে ২৫ মাইল দূরে মারপন্দম্ নামক সহর—সেখানে কুলিতর নদীর উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভযুক্ত একটি বৃহৎ সেতুর উপর দিয়া আমরা আসিলাম। তাহার পর বলরামপুর বলিয়া স্থানে পুনরায় মোটরের টোল দিতে হইল। আসিতে রাস্তার দু'পাশে টেপিওকা বলিয়া পাঁচ ছফুট উচ্চ একপ্রকার গাছের বহুচাষ দেখিতে পাইলাম। এই টেপিওকার মূল এখানকার একটি প্রধান খাদ্য। প্রত্যেক গাছের পাঁচ ছয়টি করিয়া মোটা শিকড় হয়—তাহাই তুলিয়া তাহার শাঁস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণাভ বর্ণের গৌরীপাত্র বলিয়া একপ্রকার সুদৃশ্য নারিকেল দেখিলাম তাহা দেবমন্দিরেই ব্যবহৃত হয়। এখানে নারিকেল কলা আম প্রভৃতি ফল প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। নারিকেলের ছোবড়া হইতে গালিচা পাপোষ দড়ি প্রভৃতি ব্যবহারের জিনিষ ও নানা কারু-কার্য্যের জিনিষ এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের

উত্তর অংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশেই অধিক লোকের বাস। গত লোকগণনায় ইহার ৫২ লক্ষ লোকসংখ্যার অধিকাংশই হিন্দু। মালয়লম্ এখানকার ভাষা। করমানী নদীর পর হইতেই ত্রিভেন্দ্রম সহর আরম্ভ হইল। গত ২রা জানুয়ারী তারিখে বেলা ১২টার সময় আমরা ত্রিভেন্দ্রমে পৌঁছিয়া সুন্দর সৌধাবলী দেখিতে দেখিতে পুষ্পোদ্যান শোভিত Essendeen বলিয়া মহারাজার অতিথিদিগের জন্য এক মনোরম বিশ্রামবাটীতে আসিয়া উঠিলাম। সেখানে স্নানাহারের পরই সহর দেখিতে ও এখানকার জনার্দ্দন এবং পদ্মনাভ এই প্রধান দেবতামন্দির দুটি দেখিতে বাহির হইয়া গেলাম।

ত্রিভেন্দ্রম্

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিভেন্দ্রম্ সহর সত্যই তিরুআনন্দপুরম। মালয়লমে তিরু অর্থে দেবতা—যেখানে দেবতা বাস করিতে আনন্দ পান—শ্রীপদ্মনাভ দেবের সেই নিবাস স্থানের নাম ত্রিভেন্দ্রম্। ত্রিভেন্দ্রম্ আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত। ত্রিভেন্দ্রম ভারতের একটী প্রধান তীর্থস্থান—এই তীর্থের নাম অনন্তশয়ন। এখানে শ্রীপদ্মনাভ দেবের মন্দিরের সন্নিকটে পদ্মতীর্থে এবং সমুদ্রকূলে শঙ্খ তীর্থে স্নান করিতে হয়। রামানুজ মাধবাচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্য এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। এখানকার মহারাজার নামের পূর্ণ আখ্যা "শ্রীপদ্মনাভদাস ভঞ্চিপাল কুলশেখর কিরীটপাল মান্যেয় সুল্তান মহারাজা রাজা রামভজ বাহাদুর সামসেরজঙ্গ ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি।" ত্রিভেন্দ্রম তাহার পদ্মনাভদেবের মন্দির, রাজপ্রাসাদ, শিল্পাগার, মিউজিয়ম, পশুগৃহ, শিশু নারী ও সাধারণ হাঁসপাতাল, বিচারালয়, মহিলা কলেজ, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিজ্ঞান ও

আর্টকলেজ, সাধারণ গ্রন্থাগার, গির্জ্জা, রেসিডেন্সী, চক্ষু চিকিৎসালয়, পি, ডবলিউ, ডি অফিস্' জলেরকলগৃহ, ক্লাবগৃহ, সেক্রেটারীয়েট, দিকদর্শনগৃহ ও বহু দোকানপাটের সৌধশ্রেণীতে এবং বিদ্যুতের আলোক-মালায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সহরের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে স্বদেশের পুরাতন আচার ব্যবহার ও নিয়ম নিষ্ঠায় বিরাজ করিতেছে। এখানে মহারাজার অতিথিভবনে থাকিলে দর্শকের বহিতে নাম লিখিতে হয়। আমরা রাজ-প্রাসাদের আফিসে গিয়া দর্শকের বহিতে নিজ নিজ নাম লিখিলাম ও প্রথমেই বাহির হইতে নূতন রাজপ্রাসাদটি দেখিলাম। বর্ত্তমান মহারাজা রাজ্য পাইবার পর বৎসর তিন হইল এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার নিয়ম এক রাজার প্রাসাদে অন্য রাজা বাস করেন না— প্রত্যেক মহারাজার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান প্রাসাদটি ত্রিভেন্দ্রমের সুসজ্জিত প্রশস্ত এভিনিউ রোডের উপর—পশ্চাতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের দৃশ্যপট লইয়া সম্মুখে সবুজ প্রাঙ্গনভূমি ও পুষ্পোদ্যান মধ্যে অবস্থিত।

বর্ত্তমান মহারাজা পুরাতন প্রাসাদগুলি ষ্টেটের বহু দর্শনীয় শিল্পদ্রব্যাদিতে সজ্জিত করিয়া শিল্পাগাররূপে তাহার

ব্যবহার করিতেছেন। আমরা এই পুরাতন প্রাসাদের শিল্পাগারে একখানি ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বেকার পুরাতন চীনদেশীয় শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র—কথাকলিনৃত্যের কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি আদর্শ মূর্ত্তি—তাঞ্জোর নির্ম্মিত কলসী ও গোপাল মূর্ত্তি—হস্তিদন্ত নির্ম্মিত নানামূর্ত্তি—চিত্রকর ডাঃ ররিক অঙ্কিত একটি ঋষিচিত্র—একশত বৎসর পূর্ব্বেকার হস্তিদন্তনির্ম্মিত একটি হনুমানমূর্ত্তি—কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত রামচন্দ্রমূর্ত্তি ইত্যাদি যাহা দেখিলাম সবগুলিই চিত্তাকর্ষক। একটি গৃহে ত্রিবাঙ্কুরের নানাপ্রকার অস্ত্র সজ্জিত ও সংগৃহীত রহিয়াছে। কোন গৃহে পুরাতন মহারাজাদিগের ও বর্ত্তমান মহারাজার বৃহৎ তৈলচিত্র সকল আছে। কোন গৃহে পুরাতন মহারাজাদিগের ব্যবহৃত রাজ-সিংহাসনগুলি, কোন গৃহে কাঁচের আবরণ মধ্যে তাঁহাদিগের ব্যবহৃত রাজপোষাক পাগড়ী শিরোভূষণ ইত্যাদি প্রদর্শিত রহিয়াছে। একটি পোষাকে কাঁচপোকার পাখা দিয়া প্রস্তুত যে শিল্পকার্য্য করা আছে তাহা ছোট ছোট পান্না বসাইয়া করা বলিয়া ভুল হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুর রাজের যে দ্বিরদরদনির্ম্মিত সিংহাসন ছিল তাহাও একটি সুন্দর প্রদর্শনীরূপে একটি ঘরে রাখিয়া দেওয়া

হইয়াছে। একখানি বাঁশ হইতে প্রস্তুত একটি তির্ব্বতীয় মঠ, চন্দনকাঠে প্রস্তুত অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি, লামা বুদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম্মকে একত্রে দেখাইয়া চন্দনকাঠ হইতে নির্ম্মিত একটি অপূর্ব্বমূর্ত্তি, অনেক পুরাতন তির্ব্বতীয় চিত্র, মহিষাসুরের চিত্র, তিরুআনন্দপুরম্ চিত্র, অনন্তশয্যার চিত্র প্রভৃতি যাহা সব রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকখানিই দেখিবার মত। ভগবদ্‌গীতা বলিয়া ২০০ শত বৎসরের পুরাতন বৃহৎ তৈল-চিত্র একখানি দেখিতে খুবই চিত্তাকর্ষক। চিত্রখানিতে কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব ও কৌরবগণ মধ্যে রথোপরি অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। রবিবর্ম্মা-অঙ্কিত পূর্ব্বমহারাজার একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধাতুনির্ম্মিত কতপ্রকার প্রদীপ ও পাত্রাদি কৌতুহল আনিয়া দেয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজকরা কাশীর রামনগররাজপ্রাসাদের একখানি ছবির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এই প্রাসাদশিল্পাগারে ভূতপূর্ব্ব স্বনামধন্য দেওয়ান স্যার টি মাধব রাও এর একটি মূর্ত্তি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রাসাদের সন্নিকটে পার্কে বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ণদাঁড়ান মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

এখানকার কুটীরশিল্পদ্রব্যাদির দোকানে গিয়া নানাপ্রকার মাটির দ্রব্য, বেতের চেয়ার, সোফা, বাসন ইত্যাদি, নারিকেল ছোবড়ার গদি, গালিচা, পাপোষ ইত্যাদি, নারিকেল মালায় প্রস্তুত চুরুটের ছাইফেলা পাত্র, জ্যাম রাখিবার পাত্র, কাগজ-চাপা, রেকাবি, বাটি ইত্যাদি, তাঁতে প্রস্তুত জামার নানা রকমের ছিট, সাড়ি, কাপড়, চাদর—বেনিয়ান লুঙ্গি—রকমারি পর্দ্দার কাপড়, টেবিল ঢাকা, ইত্যাদি, ছড়ি বাকস, টুপি, ছোট ছোট সুন্দর ব্যাগ, ইত্যাদি, শিং হইতে প্রস্তুত উট, হাতী, মহিষ, সারস ইত্যাদি মূর্ত্তি, হস্তিদন্ত হইতে প্রস্তুত নানারকমের দ্রব্য ও মূর্ত্তি আদি দেখিয়া খুবই আনন্দ পাইলাম।

এখানকার পশুশালা, মিউজিয়ম এবং চিত্রালয় একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রাঙ্গণে অবস্থিত। এই স্থানেই Band stand, আমরা এখানকার পশুশালায় একটা নূতনত্ব দেখিলাম। বড় বড় সিংহ, বাঘ ও কাল প্যান্থার অনেকগুলি আছে—তাহাদিগের ১মাস হইতে ৩মাস বয়সের শিশুশাবকও অনেকগুলি রহিয়াছে। সিংহ বাঘের থাকিবার ঘরগুলির পাশেই রাস্তার নীচে অনুমান ৩০।৪০ ফুট গভীর করিয়া একটি প্রশস্ত গড় কাটিয়া তাহাতে বন প্রস্তুত করা আছে।

বাঘ সিংহগুলির ঘরের মধ্য হইতে মাটির নীচে দিয়া ঐ গড়ে ও বনে নামিবার সিঁড়ি আছে। বাঘ সিংহগুলিকে ঐ বনে নামাইয়া দেওয়া হয় তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় সেখানে বেড়ায়, খেলা করে, পরস্পরকে আক্রমণ করে, তাহা উপরের রেলিং দেওয়া রাস্তাতে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাওয়া যায়। গড়খাই স্থানটির উপর দিয়া বড় বড় লোহার কাঁটা বাহির করা আছে যাহাতে কেহ লাফাইয়াও উপরে আসিতে না পারে।

জনার্দ্দন মন্দির

ত্রিভেন্দ্রম্ সহর তাড়াতাড়ি যতটুকু সম্ভব দেখিয়া এখান হইতে আমরা মোটর করিয়া ৩৫ মাইল দূর বার-কোলা নামক স্থানে বিখ্যাত জনার্দ্দন মন্দির দেখিতে ছুটিলাম। এই ৩৫ মাইল রাস্তার ২৬ মাইল অবধি আমরা কুইলন যাইবার রাস্তায় গেলাম। সারা রাস্তাটি কখন উঁচু কখন নীচু কখন পাহাড় গায়ে কখনী দুটি পাহাড়ের মধ্যে কোথাও পেচাইয়া পেচাইয়া উঁচু পাহাড়ে উঠিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—দুধারে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষের বাগান, নীচের রাঙ্গা মাটিতে সবুজ ধানের ক্ষেত—গ্রামের ছোট ঘরগুলি ছবির মত দুধারে সাজান রহিয়াছে। চোখের উপর যেন ছায়াচিত্রের ঘন পটপরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে আমরা আতিঙ্গল নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পারিবারিক দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন ও আতিঙ্গল নদী এই স্থানে বহিয়া যাইতেছে। বারকোলার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা পাহাড়ের

উপরিস্থিত এই রাস্তাটি হঠাৎ এমন একটি স্থানে আসিয়া পড়িল সেখান হইতে পাহাড়ের একপার্শ্বে নীচে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ বনরাজির সমতল ক্ষেত্র চিত্রপটের ন্যায় চোখের উপর খুলিয়া গেল। কোইলোয়ার হইতে ত্রিভেন্দ্রম্ অবধি একটি canal (নৌকাচলাচলের জলপথ) আছে। ঐ ক্যানালটি এইস্থানে প্রায় দু'মাইল পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় তাহার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। দেখিতে দেখিতে আমরা জনার্দ্দন মন্দিরের নীচে দিয়া একেবারে আরব সাগরের কুলে আসিয়া পড়িলাম ও সম্মুখে হঠাৎ সমুদ্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সূর্য্য তখন সমুদ্রের পশ্চিমকূলে অস্ত যাইতেছে—আকাশখানি তাহার বর্ণগরিমায় পূর্ণ। এই সান্ধ্য মুহূর্ত্তে সমুদ্রের পূর্ব্বকূলে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইলাম ও সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের অসীম সৌন্দর্য্য কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিলাম। এখানে সমুদ্র তরঙ্গ অস্থির আবেগে কূলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—রাস্তাটি তাহার উপরেই এইখানে শেষ হইয়াছে। রাস্তার বাঁ দিকেই আরব সমুদ্রের উপর একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় শ্রীজনার্দ্দন দেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের ঐ পাহাড় গায়ে সমুদ্রতরঙ্গ অহরহ

তোলপাড় করিতেছে। মন্দিরে উঠিবার জন্য একদিকে উঁচু সিঁড়ি গাথা আছে—অপর দিকে ঐ পাহাড়ের গা পেচাইয়া রাস্তা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা গাড়ি করিয়া উপরে মন্দিরে উঠিলাম। সেখান হইতে সমুদ্রের দৃশ্য আরও সুন্দর। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্থানে যুগযুগান্তর ধরিয়া কতকালের এই মন্দির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে হইল ভগবান বিশ্বজগতে সর্ব্বত্রই তো ব্যাপিয়া আছেন —অতঃপর তাঁহাকে যদি রূপগ্রহণ করিতেই হয় তবে সে সর্ব্বরূপের থাকিবার ইহাপেক্ষা আর কি সুন্দর স্থান হইতে পারে! ভক্তিবিনম্র অন্তঃকরণে মন্দিরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম মন্দিরের বহির্দ্বারের উপর দুপাশে দুটি হাতীর মূর্ত্তি মধ্যে সুন্দর কমলা মূর্ত্তি একটি বিরাজ করিতেছে। মন্দির অভ্যন্তরে স্বর্ণনির্ম্মিত চারিহস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং অভয় লইয়া শ্রীজনার্দ্দন মূর্ত্তি সৌম্যভাবে দাঁড়াইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির দ্বারে "স্বামী", "স্বামী", বলিয়া একটি ভক্তের করুণ ডাক প্রাণের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল। মন্দির প্রাঙ্গনে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ রহিয়াছে, ঐ বৃক্ষে বালখিল্য মুনি ঝুলিয়া থাকিয়া এই স্থানে সাধনা করিতেন। মন্দিরে লক্ষ্মীমূর্ত্তি নাই। শিবলিঙ্গ

এবং নটরাজ মূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরের নীচে চক্রতীর্থ নামে সরোবর এবং তাহার নিকটেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। এই মন্দিরের বাহিরে সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া কুমারিকার কথা মনে পড়িয়া গেল ও এইস্থানে মন্দির নির্ম্মাতার কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধকে অন্তর দিয়া অনুভব করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

এই স্থানে শ্রীজনার্দ্দন মূর্ত্তি স্থাপিত হইবার পৌরাণিক প্রবাদ হইতেছে যে বিষ্ণু নারদকে লইয়া একবার ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নমস্কার করিবার পরই চোখ মেলিয়া দেখেন বিষ্ণু অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন সম্মুখে নিজ পুত্র নারদ দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া নারদকেই অভিসম্পাত করেন। বিষ্ণু তাঁহার বল্কলখানি নিক্ষেপ করিয়া নারদকে বলেন এই বল্কল যেখানে পড়িবে তুমি সেইখানে জনার্দ্দনকে উপাসনা করিলে শাপমুক্ত হইবে। বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐ বল্কল সমুদ্রকূলে এই মন্দির স্থানে পতিত হইয়াছিল – নারদ এই স্থানে জনার্দ্দনের তপস্যা করিয়াছিলেন তাই এই স্থানের নাম বল্কলা। বর্ত্তমানে তাহার অপভ্রংশ হইয়া বারকোলা নাম হইয়াছে। ঐ বল্কল নিক্ষেপের সময় হইতে এখানে শ্রীজনার্দ্দন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

আছে। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের বারকোলা রেলষ্টেশন হইতে এই স্থান মাত্র দেড় মাইল। সমুদ্রকূলে এই মন্দিরটি প্রকৃত সাধনার স্থান। এই বহুপুরাতন দেবতার মন্দিরদ্বারে অন্তরের প্রণতি জানাইয়া আমরা সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় এই স্থান হইতে ফিরিয়া শীঘ্রই আলোকোজ্জ্বল ত্রিভেন্দ্রম পৌছিয়া শ্রীপদ্মনাথ দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

পদ্মনাভ মন্দির

দাক্ষিণাত্যে ত্রিভেন্দ্রমে শ্রীপদ্মনাভ দেবের মন্দির একটি প্রধান ও খুব বড় মন্দির। এই মন্দিরে শ্রীপদ্মনাভ শ্রীনরসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ তিন দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির সম্মুখে উচ্চ গোপুরম। গোপুরম দিয়া প্রবেশের পর মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গন। ঐ প্রাঙ্গনের চারিদিকেই ২২০ফুট করিয়া লম্বা বহু স্তম্ভবিশিষ্ট ছাত দেওয়া দীর্ঘ বারান্দা মূল দেবালয়কে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এই বারান্দাগুলিই মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পথ। এই দীর্ঘ বারান্দার প্রতি স্তম্ভে একটি করিয়া বড় প্রস্তর নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি যুক্ত হস্তে প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বারান্দাগুলির পাশে পাশে প্রস্তরের ঝাঁঝরী দেওয়াল উঠিয়াছে ও তাহার প্রতি ফাঁকে অসংখ্য প্রদীপ সংযুক্ত আছে। এই ঝাঁঝরী দেওয়ালগুলিতে মন্দির প্রাঙ্গনটি অনেকগুলি ছোট ছোট প্রাঙ্গনে বিভক্ত হইয়াছে এবং ঐ বিভুক্ত প্রাঙ্গনগুলির চারিপাশের দেওয়ালে ঝাঁঝরীতে ক্রমান্বয় প্রদীপ সাজান

রহিয়াছে। এই মন্দির শুধু প্রদীপেই আলোকিত এখানে বিজলীর আলো দেওয়া হয় নাই। সহস্র স্তম্ভের মণ্ডপ এবং আরও ছোট ছোট মণ্ডপ মন্দিরশ্রীর অনিবার্য্য অঙ্গ স্বরূপ শোভা পাইতেছে। মণ্ডপে নটরাজ এবং অন্যান্য মূর্ত্তিসহ বরাহ ও মৎস্য অবতারের শ্রীবরাহম ও শ্রীমৎস্যম মূর্ত্তি দুটি পৃথক মন্দিরে বিরাজ করিতেছে। এক স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের একটি ত্রিমূর্ত্তি রহিয়াছে। একত্রে ঐ ত্রিমূর্ত্তি দেবতার নাম শাস্তা। শাস্তা দাক্ষিণাত্যের দেবতা—উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়া, বাংলাদেশে ইঁহার অস্তিত্ব নাই।

শ্রীপদ্মনাভ দেবের বৃহৎ মূর্ত্তি শেষসর্পের উপর অনন্ত শয়নে মন্দির মধ্যে দীর্ঘবিলম্বিত রহিয়াছেন। তাঁহার মন্দির প্রকোষ্ঠের প্রথম দ্বার দিয়া তাঁহার শিরদেশ ও তদুপরি শেষ নাগফণা দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় দ্বার দিয়া তাঁহার নাভিকমল এবং তৃতীয় দ্বারে তাঁহার চরণযুগল দেখা যায়। দেবতার ভোগমূর্ত্তি ভূমিমূর্ত্তি সহ এই তৃতীয় দ্বারে অবস্থিত। শ্রীপদ্মনাভ দেবের মুখে নাভিতে এবং পাদপদ্মে তিন স্থানেই পূজার্চ্চনা করিতে হয়—এই তিন স্থানেই পৃথকরূপে আরতি হইয়া থাকে। শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনরসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের এই দেবতাত্রয়ের ভোগমূর্ত্তি

তিনটিকে প্রতিদিন তিনবার করিয়া মন্দিরের দীর্ঘ অলিন্দ-দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া আনা হয়। সন্ধ্যার পর মশালের আলো ধরিয়া মনোরম বাজনা বাজাইয়া এই দেবতাত্রয়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করা দেখিয়া আনন্দ হইল। প্রথমে ডঙ্কা ঢাক ও সানায়ের বাজনা চলিয়াছে—দেবতার আগে আগে আলো ধরিয়া অনেক লোক চলিয়াছে—তিনজন ব্রাহ্মণের মস্তকোপরি পাশাপাশি হইয়া তিন দেবতামূর্ত্তি চলিয়াছেন—তাহার পিছনে কতকগুলি স্ত্রীলোক প্রদীপের আলো লইয়া চলিয়াছে। মন্দিরে দেবদাসীর নৃত্য উঠিয়া গেলেও এই মন্দিরে দেবতার আলো বহন করিবার জন্য বেতন ও বৃত্তিভোগী স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করাইবার পর দেবতাদিগকে নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে প্রদীপ ও কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিয়া শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। এই শয়নারতির সময় আমরা দেবতা দর্শন করিলাম ও শ্রীপদ্মনাভ দেবের মুখারবিন্দ, নাভিকমল ও চরণপদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রণাম জ্ঞাপন করিলাম ও তাঁহার মন্দির নিকটে একটি পাত্রে রক্ষিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

এই মন্দিরে শ্রীপদ্মনাভ দেবকে মাটিতে মাথা নামাইয়া প্রণাম করিবার অধিকার এখানকার এক মহারাজা ব্যতীত

অন্য কাহার নাই। মহারাজা শ্রীপদ্মনাভ দাস বলিয়া একমাত্র তিনিই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেই শ্রীপদ্মনাভ দেবের অধিকৃত সম্পত্তি হইয়া যাইতে হয়। এক মহারাজার পরলোকান্তে নূতন মহারাজা মন্দিরে গিয়া শ্রীপদ্মনাভ দেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন ও তাঁহার সম্মুখে রাজতরবারি ও কটিবন্ধ গ্রহণ করিয়া শ্রীপদ্মনাভ-দাস হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। মহারাজার পুত্র জন্মলাভ করিলে তাহাকে মন্দিরে আনিয়া দেবতার দ্বারে শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুরের পরাক্রমশালী মহারাজা মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা কর্ত্তৃক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীপদ্মনাভ দেবকে অর্পিত হইয়াছিল।

এই মন্দিরে লক্ষ দীপ উৎসব বলিয়া প্রতি বৎসর একটি উৎসব হয়—ঐ সময় মন্দিরে লক্ষপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিবার নিয়ম কিন্তু মন্দিরের সকল প্রদীপগুলি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহা গণনায় লক্ষ দীপের অধিক হইয়া যায় এবং তাহাতে ঐ সময়ে মন্দিরে দীপমালার সৌন্দর্য্য সহজেই অনুমেয়। মন্দির হইতে সমুদ্রকূল তিন মাইল হইবে। মন্দির হইতে ত্রিভেন্দ্রম সহরের মধ্য দিয়া এই তিন মাইল

ধরিয়া একটি প্রশস্ত রাস্তা ঐ সমুদ্রকূলে গিয়াছে। সেখানে সমতল বেলাভূমিতে শান্ত সমুদ্রকূলে শঙ্খমুখম্ বলিয়া স্নানের ঘাট এবং ঘাটের সন্নিকটে ভগবতীর মন্দির আছে। এই শঙ্খমুখম্ ঘাটই শঙ্খতীর্থ। এখানকার দেবতার প্রধান উৎসব সময়ে শ্রীপদ্মনাভ শ্রীনরসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণের ভোগমূর্ত্তিকে প্রতিবৎসর মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া এই শঙ্খমুখম ঘাটে শঙ্খতীর্থে সমুদ্রস্নান করাইতে লইয়া যাওয়া হয়। এই শোভাযাত্রায় স্বয়ং মহারাজাকে এবং দেওয়ান ও অন্যান্য সকল রাজকর্ম্মচারীকেই হাঁটিয়া সাগরকূল অবধি যাইতে হয়। দেবতার এবং তৎসহ মহারাজার এই শোভাযাত্রা দেখিতে রাস্তার দুই পার্শ্বে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে। আমরা পরদিন সকালে এই শঙ্খমুখম্ ঘাটে সমুদ্র দর্শন করিয়া আসিলাম। এই শঙ্খমুখম্ ঘাটের রাস্তাতে ত্রিভেন্দ্রমের 'এয়ারোড্রোম' এবং সমুদ্রকূলে একটি 'এ্যাকোয়ারিয়াম' (সামুদ্রিক মৎস্যগৃহ) আছে।

পদ্মনাভ মন্দিরটি কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার ৯৫০ দিন পরেই অর্থাৎ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত। এই

মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ গল্পও প্রচলিত আছে। মন্দিরের এই স্থানে আনন্দকড় বৃক্ষের বন ছিল—সেখানে নিম্নশ্রেণীর লোক পারিয়াগণ বাস করিত। একদিন এক পারিয়া স্ত্রীলোক বনমধ্যে একটি নব প্রসূত শিশুর কান্না শুনিয়া গিয়া দেখে একটি বৃহৎ সর্প একটি শিশুকে আগলাইয়া রহিয়াছে। পারিয়া স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া সর্পটি সরিয়া গেল কিন্তু স্ত্রীলোকটি চলিয়া আসায় সর্পটি আবার শিশুর কাছে আসিল। স্ত্রীলোকটি এবং সর্প উভয়ের দ্বারাই শিশুটি মানুষ হইতে লাগিল। এই স্থানের রাজা এই ঘটনার কথা শুনিয়া শিশুটিকে দেখিতে যান কিন্তু শিশু এবং সর্প দুইই অন্তর্হিত হওয়ায় রাজা শিশুকে দেখিতে পান না। ঐ রাজাই এইস্থানে শ্রীপদ্মনাভ দেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মন্দির করিয়াছিলেন। শ্রীপদ্মনাভ দেবের মন্দির মধ্যে একটি পুরাতন রাজপ্রাসাদও আছে।

এই মন্দিরে এখনও প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দুই হাজার করিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে দেওয়া হয়। আমরা মন্দিরের যে সুদীর্ঘ প্রশস্ত পাথর বাঁধান ছাতদেওয়া বারান্দা দেখিলাম তাহাতে বসিয়াই এই দৈনিক দুই সহস্র লোক

ভোজন করিয়া থাকে। এইরূপ খাইতে দেওয়াতে পুণ্য থাকিলেও ইহার ফলে আলস্যের ও অকর্ম্মণ্যতার যে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে রাজা এই স্থানে এই বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বহুলোকের প্রাণসংহার করিয়া তাঁহাকে এইস্থানে মন্দিরের ভূমিসংগ্রহ করিতে হইয়াছিল তাহারই প্রায়শ্চিত্তরূপে ওই রাজা পুরাকাল হইতেই দৈনিক এই দুই সহস্র লোকের ভোজন করাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা আজিও চলিয়া আসিতেছে।

মন্দির দেখিবার পর আমরা ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার. পি, সি, রামস্বামী আয়ার, কে. সি. এস. আই'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাদিগকে আরও দু'দিন এখানে থাকিয়া এখান হইতে ১৭০ মাইল দূরে এখানকার বন্য পশু রক্ষা করিবার স্থানটি game sanctuary দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। স্থানটি পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য। ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরে প্যারিয়া নদীতে বাঁধ দিয়া একটি বৃহৎ হ্রদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ হ্রদের দুধারে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রক্ষিত বন ও গভীর অরণ্যে বন্য হাতী, সিংহ, বাঘ, কালো এবং দাগ বিশিষ্ট প্যান্থার, বাইসন, হরিণ

প্রভৃতি সবরকম বন্য জন্তু প্রচুর পরিমানে থাকে এবং বনে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা কালে তাহারা দলে দুলে ঐ হ্রদে জল খাইতে আসে। রাজ ষ্টিমারে বসিয়া হ্রদের মধ্যে ৮।১০ হাত দূর হইতে ঐ সকল বন্য জন্তুকে ও তাহাদের জল খাওয়া দেখিতে পাওয়া যায়। জলের উপর তাহারা কোন আক্রমণ করে না। আমাদিগের একান্ত থাকিবার উপায় না থাকায় আমরা সেখানে যাইতে পারিলাম না। স্যার রামস্বামীর বাটিতে ঘরের দেওয়ালে এখানকার চিত্রকরের একখানি fresco painting দেখিলাম। চিত্রটির বিষয় সেকালের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৌরবদিগের একটি ভোজ হইতেছে। ঐ চিত্রমধ্যে বর্ত্তমান মহারাজা এবং তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার দেওয়ান স্যার রামস্বামী নগ্নপদে দাঁড়াইয়া ভোজের তত্বাবধান করিতেছেন। চিত্রখানিতে পুরাকালের সহিত বর্ত্তমানকে সুন্দর সামঞ্জস্যে মিলাইবার অভিনবত্ব ও তদ্বারা মহারাজাকে প্রীত করিবার কল্পনা প্রশংসনীয়।

ত্রিভেন্দ্রমে আমরা যে অতিথিভবনে ছিলাম তাহা এবং এখানে আরও পাঁচ সাতখানি অতিথিভবন আধুনিক আরামের সর্ব্বপ্রকার পাশ্চাত্য আসবাবে ও পুষ্পোদ্যানে সুসজ্জিত। এইসকল অতিথিভবন ব্যতীত ত্রিবাঙ্কুর

রাজ্যের Mascot Hotel বলিয়া মনোরম উদ্যান পরিবেষ্টিত সুসজ্জিত একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর থাকিবার স্থান আছে আগন্তুকরা সেখানে আসিয়াও উঠেন। মালয়ম ভাষায় 'মাস্কট' অর্থে সৌভাগ্য বোঝায়। এই হোটেলখানি ও আরও অনেক হোটেল—এইস্থান হইতে দূর দূর স্থানে মোটর বাস গাড়ী চালান ও আরও অনেক প্রকার কার্য্য ব্যবসা হিসাবে এখানে রাজষ্টেট হইতে পরিচালনা করা হয়। এখানকার বাড়ীগুলির ছাদ সবই ঢালু ও লালবর্ণের টালিদ্বারা প্রস্তুত। এখানকার এক ঘোড়ায় টানা ঝট্‌কা গাড়ী বেশ পালিশ করা একটি কাঠের উঁচু বাক্সের ন্যায় দেখিতে, তাহার উপরে ক্যাম্বিসের গোলাকার ছাদ দেওয়া এবং তাহা খুব দ্রুত চলিতে থাকে। কিন্তু এখানকার স্থানীয় সময় কিছু বেশী পিছাইয়া চলে—রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় হইতে তাহা আরও বাইশ মিনিট পশ্চাদ্‌পদ। স্বাধীন রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর নানাপ্রকারে উন্নত। দক্ষিণভারতে ত্রিবাঙ্কুরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এবং হাঁসপাতালগুলি বিশেষ করিয়া আধুনিক প্রয়োজনোপযোগী সাজসরঞ্জামে ও আসবাবপত্রে পূর্ণরূপে সজ্জিত। ত্রিবাঙ্কুর তাহার সমুদ্রকূল, বিস্তৃত পর্ব্বতমালা, জলপথ

ক্যানাল, নদী, হ্রদ, সবুজ শস্যক্ষেত, ঘন নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণী, উর্ব্বরা লাল মাটী, আরামপ্রদ পরিচ্ছন্ন রাস্তা ঘাট, জনাকীর্ণ দোকানপাট, বাড়ীঘর, দেবমন্দির, শিল্পসম্ভার প্রভৃতি লইয়া জননী ভারতভূমির নিম্নপ্রান্তে শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেছে। ত্রিবাঙ্কুর বেড়াইতে আসিবার উপযুক্ত স্থান। আমরা কুমারিকাতে যাইবার পথে তিনিভেল্লী হইতে এখানকার অতিথি ভবন বিভাগের একজন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ আয়ার আমরা এখান হইতে ফিরিবার সময় ট্রেনে উঠা পর্য্যন্ত বরাবর আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন ও মন্দিরাদি সব দেখাইয়াছেন। তাঁহার এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজের সৌজন্য ভুলিবার নহে। আমরা গত ৩রা জানুয়ারী সকাল ৮ টার সময় ট্রিভেণ্ড্রাম্ এক্সপ্রেস ট্রেনে ত্রিভেন্দ্রম্ ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করিলাম ও পরদিন সকাল ৭টায় গৃহে ফিরিবার পথে মান্দ্রাজ আসিয়া পৌছিলাম।

পর্য্যটন শেষে

ত্রিভেন্দ্রম হইতে কুইলন অবধি সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইন আরব সাগরের নিকট মালাবার উপকূল দিয়া আসিয়াছে। কুইলন আসিতে স্থানে স্থানে ট্রেন হইতে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে বারকোলাতে আমরা জনার্দ্দন মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম সেই বারকোলাতে একটি রেলষ্টেশন আছে। সেখানে আসিতে ট্রেন হইতে আমাদিগের পূর্ব্বদিনের মোটর পথ ও তাহার পাশের বনভূমি সুন্দর দেখাইতেছিল। কুইলন ছাড়িয়া একস্থানে জলে রক্তকুমুদরাশি ফুটিয়া আছে দেখিয়া মন নাচিয়া উঠিল। যাহা সুন্দর তাহা সর্ব্বত্রই আনন্দের জিনিষ হইলেও এই রক্তকুমুদ ফুল যে বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ— তাহাদিগকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে দেখিয়া মনের এই আনন্দের মধ্যে যেন একটা সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রীতিও দেখা দিয়া গেল। ত্রিভেন্দ্রম হইতে রেল লাইনটি কখনো পাহাড়ের নীচে দিয়া কখনও উপর দিয়া কখনও দুধারে

পাহাড়ের মধ্য দিয়া বরাবর লালমাটি এবং স্থানে স্থানে পাহাড়গুলি অবধি লাল তাহার পাশ দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পুনালুর ষ্টেশনে দেখিলাম কলাগুলির অবধি গায়ের রং লাল। এই ষ্টেশনে কাঁদি কাঁদি লাল কলা, হলদে কলা এবং প্রচুর বড় বড় আনারস বিক্রয় হইতেছে। দাক্ষিণাত্যের সব রেল ষ্টেশনেই কলা যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। পুনালুর ষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ী দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটি ক্যানালের উপর দিয়া আসিল। পাহাড় মধ্যে ঐ ক্যানালের উপর লোক যাতায়াতের আর একটি দীর্ঘ খিলান সেতু ট্রেনের জানালা দিয়া সুন্দর দেখাইতেছিল। এইখান হইতেই ট্রেন পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে পাহাড়ের উপর বড় গাছপালার বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃই উঁচুতে উঠিতে লাগিল। দু'ঘণ্টা ধরিয়া এই উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়া ট্রেন আসিল। একটি পাহাড় হইতে আরাকটি পাহাড়ে যাইতেছে—মধ্যে মধ্যে উপত্যকা—পাহাড়ের উপর আকাশ ছোঁয়া ঘন বৃক্ষ ও গভীর সতেজ অরণ্যের দৃশ্য খুবই মনোরম। স্থানে স্থানে পাহাড়ের উপর হইতে রেলের পাশেই গভীর নিম্নভূমি ও দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থিত গভীর খাত পার হইয়া যাওয়া রোমাঞ্চকর হইয়া উঠে। ত্রিভেন্দ্রম হইতে

প্রায় ৭০ মাইল আসিয়াই সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের ৩০ মাইল ব্যাপী হিল্ সেক্সনে পুনালুর, এডামাম্বু, টেনমালাই এরিয়ানকাভু, ভগবতীপুরম্ ও সেনকোটা এই ৬টি ষ্টেশনই পাহাড়ের উপর ছবির মত অবস্থিত। চারিদিকে পর্ব্বত-চূড়া একটির উপর একটি আকাশে উঠিয়া মনের মধ্যে অনন্ত অসীমের ছবি আঁকিয়া দিতেছে। এই ৩০ মাইল আসিতে ট্রেন পাঁচটি Tunnel (সুড়ঙ্গের) মধ্য দিয়া আসিল। এরিয়ানকাভু ষ্টেশনটির পরই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুদীর্ঘ টানেলটি পার হইতে প্রায় ৫ মিনিট সময় লাগিল। ইহার পরই একটি সুপ্রশস্ত গহ্বর পার হইয়া কিছুক্ষণ পরেই পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের শিখর হইতে নিম্নে দূরে সমতলভূমি ও সবুজ ধানের ক্ষেত দেখা দিয়া দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন করিয়া-দিল। ভগবতীপুরম্ ষ্টেশনটি চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত মালার মধ্যস্থিত একটি গোলাকার অধিত্যকা ভূমিতে শোভমান হইয়া আছে। এইখান হইতেই ঘাট পর্ব্বতশ্রেণী রেল লাইন হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া গেল। পাহাড়ের উপর আসিতে বেশ একটু মনোরম ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল। বেলা ২টার সময় সেনকোটা ষ্টেশনে আসিয়া আমরা আহার করিয়া লইলাম। সেনকোটার পর হইতে আবার তালবৃক্ষ

তৃণাকীর্ণ প্রান্তর ভূমির দুধারে প্রচুর ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়া দূরে আকাশগায়ে সারাপথ পর্ব্বতশিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সন্ধ্যাবেলা মাদুরা আসিয়া রাত্রি প্রভাতে ৪ঠা জানুয়ারী বেলা ৭টায় মান্দ্রাজের Egmore (এগমোর) ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। ঐ দিন মান্দ্রাজে দিনমান কাটাইয়া পুনরায় সন্ধ্যা ৭টায় কলিকাতামেলে উঠিয়া এই দীর্ঘ পর্য্যটন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

মান্দ্রাজের Mysore craft এর দোকানে গিয়া চন্দন কাষ্ঠের প্রস্তুত দ্রব্যাদি, সতরঞ্চ, গালিচাদি, সাড়ী কাপড়াদি, কাঠের খেলনা, ট্রে, টেবিল, চেয়ার, সোফা আদি ও বেকেলাইটে প্রস্তুত সাবানপাত্র ডিস ইত্যাদি ও আরও নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিয়া সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিষ ও নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে স্বাধীন রাজ্যগুলি মধ্যে মহীশূর যে কতদূর অগ্রণী তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। ত্রিবাঙ্কুরে যে সৌন্দর্য্যময় পাহাড় দেখিয়া আসিলাম মান্দ্রাজের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে গিয়া তাঁহার অঙ্কিত একখানি চিত্রে তাহার প্রতিকৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। হিমালয়ের তুষারশুভ্র শীর্ষ থাকিতে ত্রিবাঙ্কুরের এই অস্তমিত সূর্য্যের

কিরণদীপ্ত শৈলশিখর কেন যে শিল্পীর কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা ত্রিবাঙ্কুরের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শিল্পী চিত্রখানির নাম দিয়াছেন "Travancore Rock" এবং বিক্রয়ার্থ তাহার মূল্য ধরিয়াছেন ১৫০০৲ টাকা। চিত্রখানি তখনও বিক্রয় না হইয়া শিল্পীর গৃহশোভা করিতে থাকায় মনে হইল এই অন্নচিন্তাক্লিষ্ট দেশে শিল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিবার যোগ্যতা থাকিলেও তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া আদর করিবার ক্ষমতা কয়জনের আছে।

মান্দ্রাজ হইতে ট্রেনে রাত্রিতে ঘুমাইয়া গোদাবরী ষ্টেশনের অনেক আগেই সকাল হইয়া গেল—ট্রেনেই হাতমুখ ধুইয়া এল্লোর ষ্টেশনে চা খাইয়া লইলাম। রাজমন্দ্রী ষ্টেশনটি ও সেখানকার কাঠের নানারকম খেলনা দেখিয়া প্রীত হইলাম। সোমালকোট ষ্টেশনে নামিয়া স্নান করিলাম ও ট্রেনেই ইক্‌মিক্ কুকারে করিয়া যে সুন্দর ঘি ভাত হইয়াছিল টুনী ষ্টেশনে আসিয়া তাহাদ্বারা আহার শেষ করিলাম। ইক্‌মিক্ কুকারটি ফিরিবার সময় কাজে লাগিয়াছিল। ওয়ালটেয়ার, ভিজিয়ানাগ্রাম প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশনগুলি এবং ট্রেণের জানালা দিয়া দুধারে সবুজ বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে লাল রংয়ের চওড়া

রাস্তা কোন দূর গ্রামে গিয়া উঠিয়াছে—কোথাও ছোট্ট গ্রামখানির কোন বাড়ির উঠানে চাষা কাজ করিতেছে—ফিরিবার পথে আবার পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণী রেলের ধারে ধারে চলিয়াছে অলস নয়নে পথের এই দৃশ্যপট দেখিতে দেখিতে দিনমান কাটিয়া গেল। আর এক রাত্রির পর তবে ৬ই জানুয়ারী বেলা ১১ টার সময় বাঙ্গালী জীবনের আরাম স্বর্গ আপন বাড়িঘরে আসিয়া পৌছিলাম ও স্নান করিয়া প্রবাস শ্রান্তি দূর করিয়া ফেলিলাম। এমনি করিয়া এবারকার পর্য্যটন শেষ হইল কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অনেক কিছুই দেখা বাকি রহিয়া গেল। ওয়ালটেয়ার, সীমাচলম্, চিদাম্বরম, তিরু চেন্দুর, পণ্ডিচারী, মহীশূর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি মোটামুটি আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান সময়াভাবে দেখা হইল না। যাই হোক যাহা দেখিলাম আমার এ অপটু দেহের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

দাক্ষিণাত্য বলিতে ভারতবর্ষের কটিদেশে মেখলা স্বরূপ অবস্থিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে গোদাবরী নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যে দক্ষিণাংশ সাধারণতঃ তাহাই বোঝায়। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত অংশে আর্য্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন

বলিয়া ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্য কখন অধিকার করেন নাই এবং দাক্ষিণাত্যে বাস করেন নাই বলিয়া আমাদিগের একটা সাধারণ জ্ঞান আছে। কিন্তু তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে না আসিলে দাক্ষিণাত্যের এই বহু পুরাতন দেব দেবীর মন্দির সকল, তাহাতে নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণধর্ম্মের জাতিভেদগত পার্থক্য কোথা হইতে আসিল ? আর্য্যগণ সম্ভবতঃ এই বিন্ধ্যপর্ব্বতকে প্রথমে অতিক্রম করা দুরূহ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়াই বিন্ধ্যপর্ব্বত তৎকালে সূর্য্যের গতিরোধ করিত বলিয়া পুরাণে তাহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যপর্ব্বতকে তিনি ফিরিয়া না আসা অবধি যে মস্তক অবনত করিয়া থাকিবার আদেশ করিয়া গেলেন এই পৌরাণিক বর্ণনা হইতেই বোঝা যায় যে বিন্ধ্যপর্ব্বত আর তেমন উচ্চ অলঙ্ঘনীয় রহিলনা—আর্য্যঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্যকে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে আসিয়া অবস্থান করিলেন। তাঁহার অনুকরণে আরও আর্য্যগণ যে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বহু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যের সুদূর দক্ষিণাংশে অর্থাৎ তাঞ্জোর মাদুরা মালাবার প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্ব হইতেই চোল পাণ্ড্য

প্রভৃতি পুরাকালের রাজাদিগের শাসন এবং আচার পদ্ধতি ও সামাজিক সংগঠন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকায় দাক্ষিণাত্যের এই অংশে আর্য্যপ্রভাব আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই এবং এখানকার তামিল তেলেগু প্রভৃতি প্রচলিত ভাষাতেও কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই। সেইজন্যই একেবারে সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জিত এই অঞ্চলের ভাষা আমাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য। গোদাবরী নদীর নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ স্থানই তখন অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। আর্য্যগণ আসিয়াই সেখানকার বন্য অধিবাসিগণকে তাঁহাদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনকারী রাক্ষসাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গোদাবরী নদীর তীরে দণ্ডকারণ্যে যে পঞ্চবটীবনে রাম আসিয়া বাস করিয়াছিলেন ঐ পঞ্চবটীবন অগস্ত্যমুনির আশ্রম হইতে দুই যোজন দূরে অবস্থিত বলিয়া কথিত। বর্ত্তমানে বোম্বাই প্রদেশে নাসিক নামক স্থানে এই পঞ্চবটী বনকে নির্দ্দিষ্ট করা হয় কিন্তু বিন্ধ্য-পর্ব্বত পার হইয়া আসিয়া রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যের ঐ সুদূর পশ্চিমাংশে নাসিকের নিকট গিয়াছিলেন কিনা তাহা রামায়ণে এবং ভবভূতির উত্তররামচরিতে পঞ্চবটীর নিকট গোদাবরী নদীর বিশালত্বের যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে

এবং অন্যদিকে নাসিকের নিকট গোদাবরীর সঙ্কীর্ণতা হইতে যুক্তিযুক্তরূপে সন্দেহ করিতে পারা যায়। যাই হোক রামায়ণের আখ্যায়িকার লীলাভূমি শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধন ক্ষেত্র ও ভারতের পৌরাণিক ইতিহাসের প্রধান স্থান এই বিশাল দাক্ষিণাত্যের কতকাংশেও জীবনে একবার আসিবার সুযোগ পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম।

বাংলার ধূসর মাটির লোক বিহারের মধুপুর দেওঘরে লালমাটি দেখিয়া সেই শুষ্ক কাঁকর লালমাটির দেশে আসিতে কত ভাল লাগিত কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মাটি যে এমন সরস ও গাঢ় টুকটুকে লাল তাহা পূর্ব্বে কখন জানিতাম না। এখানকার মাঠে যে আবার সবুজ ধানের উপর দিয়া বাংলা-কবির বর্ণিত মধুর ঢেউ খেলিয়া যায় তাহারও কোন ধারণা ছিল না। দাক্ষিণাত্যের বক্ষখানি যেমন পর্ব্বতমালায় পরি-বেষ্টিত তেমনি বহু নদ নদী-হ্রদ সরোবরে সুশোভিত। তাহার উঁচুনীচু মাঠগুলি ধানের ক্ষেতে পরিপূর্ণ। চিংলিপুট প্রভৃতি অনেক স্থানে একজমিতে বছরে দু'বার করিয়া ধান হয়। বাংলা দেশে এ সময় আমন ধান কাটা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখানে এখন আবার নূতন করিয়া ধান রোয়া হইতেছে ও কত ক্ষেত নবীন সতেজ ধানে পূর্ণ রহিয়াছে। সমুদ্র

উপকূল বলিয়া এখানে সময়োপযোগী বৃষ্টির অভাব হয় না। তাহা ছাড়া যে সব বড় বড় হ্রদ আছে তাহার জল ইচ্ছামত ক্ষেতে লইয়া যাওয়া যায় ও অনেক ক্যানাল আছে তাহাতেও চাষের খুব সহায়তা করে বলিয়া এখানে বাংলাদেশের ন্যায় চাষাকে শুধু আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। মাঠগুলি সব সময়েই সবুজ শস্যপূর্ণ থাকে। মাঠের এই অপর্য্যাপ্ত ফসল মধ্যে আবার অসংখ্য তাল নারিকেল কলা গাছের বনরাজিতে চারিদিকে সবুজের ঢেউ খেলিয়া যায়। বসুন্ধরার লাল বুকের উপর প্রকৃতির এই সবুজ আঁচলখানি হইতে যে রূপ মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার কাছে বাংলার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রূপটিও যেন মলিন হইয়া পড়ে। সোনার বাংলা চিরদিন শস্যশ্যামলা বলিয়া মনে মনে বড় গর্ব্ব ছিল কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আসিয়া মান্দ্রাজ ও মালাবার উপকূলে দেশ মাতৃকার অত্যুজ্জ্বল শস্যশ্যামল রূপ দেখিয়া মনের সে গুমোর ভুলিয়া গিয়া ভারতজননীর চরণপ্রান্তে মুগ্ধনেত্রে মাথা নোয়াইলাম। মনে হইল বাংলায় সত্যই আমরা কিসের গুমোর করি? দাক্ষিণাত্যের দেবদেবীর মন্দিরের সৌন্দর্য্য, তাহার প্রস্তর শিল্প ও ভাস্কর্য্য স্থাপত্য, তাহার দারুশিল্প, পঞ্চলৌহ নির্ম্মিত মূর্ত্তিশিল্প, নানা কারুকার্য্য, তাহার

সঙ্গীত নৃত্যকলা, মন্দিরের আলপনা নৈপুণ্য প্রভৃতির কাছে আমাদের তুলনা করিবার কি আছে? আমাদের যাহা বা ছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—এমন কি আমরা ধর্ম্ম অবধি হারাইয়া ফেলিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া যাহা কিছু আছে তাহা এখন অন্ধ্র এবং দ্রাবিড় এই দাক্ষিণাত্য দেশে ইহার দেব মন্দিরগুলির পূজানুষ্ঠানে ও নিয়ম-নিষ্ঠা আচার ব্যবহারের অনুশাসনে অটুট রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই মন্দিরগুলির অধিষ্ঠাতা দেবতা সকলের নিত্য পূজার্চ্চনায় হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসকে আজও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন উত্তর ভারতকে বহুকাল হইতে বৈদেশিক আক্রমণ সংঘাতে যেরূপ বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে দাক্ষিণাত্যকে সেরূপ হইতে হয় নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যও যে একেবারে বিধর্ম্মীর সংশ্রবে কখনও আসে নাই বা কোন নির্য্যাতন ভোগ করে নাই তাহা নহে। অন্তত গত দেড়শত বৎসর হইতে পাশ্চাত্য সংশ্রবে আসিয়াও দাক্ষিণাত্য যেমন তাহার পরণপরিচ্ছদ আহার প্রভৃতিতে নিজস্ব আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে পরানুকরণপ্রিয় আমরা তাহার কিছুই পারি নাই—তাহার একমাত্র কারণ বোধ হয় আমাদিগের নিজধর্ম্মে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব।

এখানকার পাশ্চাত্য শিক্ষিত এডভোকেট বা জজ হইয়াও অনেকে কপালের উপর অর্দ্ধেক মাথা কামাইতে, নগ্ন দেহপদে চলিতে ও দাক্ষিণাত্যের প্রথায় কাপড়খানি শুধু পেঁচিয়া পরিতে কেহ কোন সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করেন না।

উত্তর ভারতের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের নারীদিগের মাথায় কাপড় দিবার কোন রীতি নাই এবং বিবাহিতা নারীর সীমন্তে সিঁদুর পরিবারও কোন প্রথা নাই। ললাটে কুঙ্কুমের টীপ কণ্ঠে স্বুবর্ণ ত্রিমঙ্গল (সরু হারে গাঁথা তিনটি সোনার পদক বা ফুল) এবং নাসিকা ও কর্ণে হীরা পরাই বিবাহিত জীবনের একমাত্র লক্ষণ ও অবশ্য পালনীয় নিয়ম। দাক্ষিণাত্যের তামিল নারী সাধারণত উত্তর ভারতের নারী অপেক্ষা হীনরূপা হইলেও তাহাদিগের স্বাস্থ্যপূর্ণদেহ—রঙ্গীন সাড়ী—বেণী করা চুল তাহাতে ফুলের মালা তাহাদিগকে সদা প্রফুল্ল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। এখানে রেল ষ্টেশনে এবং সহরে প্রচুর ফুলের মালা বিক্রয় হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে জরির কাজের সহিত যে ফুলের মালা ও শুধু গোলাপ ফুলের যে বড় বড় মোটা গড়ে মালা প্রস্তুত হয় তাহার সাধারণ কারুকার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। মালাবার উপকূলের সাধারণ নারী তামিল নারী হইতে

দেখিতে সুশ্রী। তামিল নারীর মধ্যে যে সুশ্রী গৌরবর্ণ আকৃতি নাই তাহা নহে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষা ও কৃষ্টি নারীকে সর্ব্বত্রই সুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষিত তামিল নারীর মধ্যে পুরুষের সঙ্গে কথা বার্ত্তা ও ব্যবহারে একটা কুণ্ঠাহীন সুন্দর ভদ্ররীতিও তাঁহারা মাথায় কাপড় না দিলেও তাঁহাদিগের চালচলনে একটি লজ্জানম্রভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহারা অনেকেই ইংরাজিতে কথা কহিতে সক্ষম।

ইংরাজী ভাষাটি দাক্ষিণাত্যে উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানীর ন্যায়ই প্রচলিত। উত্তর পশ্চিম ভারতে গিয়া উর্দ্দু হোক হিন্দুস্থানী হোক তাহা তবু বুঝিতে পারা যায় ও কিছু না জানিলেও "হাম" "তোম" যা হয় করিয়া একরকম কাজ চালাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তামিল ভাষায় বা মালায়লমে দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য কোন বাঙ্গালীর নাই। কাযেই বাঙ্গালীকে এখানে আসিয়া একমাত্র ইংরাজি ভাষাতেই সকলের সঙ্গে কথা কহিতে হয়। আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষাও তামিলদিগের নিকট সমান ভাবেই দুর্ভেদ্য। সুবিধার বিষয় এই যে এখানকার কুলি মজুর প্রভৃতি কাজ করা লোক অনেকেই কিছু কিছু ইংরাজি জানে ও বুঝিতে পারে।

দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডা ও পুরোহিতদিগের মধ্যে উত্তর ভারতের তীর্থস্থানের পাণ্ডাদিগের লোভের উপদ্রব ও অর্থদাবীর কোন পীড়ন নাই। এখানে প্রায় সকল মন্দিরই দেবস্থান আইনানুসারে পরিচালিত। প্রত্যেক মন্দিরের অল্প বিস্তর সম্পত্তি আছে। বড় বড় মন্দিরগুলি সবই দাক্ষিণাত্যের সেকালের দানপতি রাজা ও ধনীদিগের দানের অর্থে পরিচালিত ও আজও সঞ্জীবিত রহিয়াছে। বড় বড় মন্দিরে দেবতাদিগের কোটী কোটী টাকার রত্ন অলঙ্কারাদি আছে ও দুই তিন লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয় আছে। যেমন আয় ব্যয়ও সেই পরিমাণ। মন্দিরের এই আয় ব্যয় ও অন্যান্য কার্য্য পরিচালনার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ট্রাষ্টি ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। অনেক মন্দিরে একটি করিয়া বাক্স বসান আছে। দেবতাকে প্রণামী দিলে ঐ চাবিবন্ধ বাক্সের মধ্যে উপরের ছিদ্র দিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। বড় বড় মন্দিরে দেবতার অলঙ্কার রত্নাদি রক্ষা করিবার জন্য লৌহদ্বারবিশিষ্ট সুরক্ষিত প্রকোষ্ঠ আছে। উৎসবের সময় দেবতাকে ঐ সব বহু মূল্য রত্নালঙ্কার পরাইয়া দেওয়া হয়।

দেবতার পূজার জন্য যেমন মন্দিরে বাজনা হইয়া থাকে তেমনি দেবতার প্রীতির জন্য পূর্ব্বে দেবদাসীগণ

মন্দিরে নৃত্যগীত করিয়া থাকিত। দাক্ষিণাত্যে দেবতার পূজায় ও উৎসবে বহুদিন হইতেই দেবদাসীর নৃত্য চলিয়া আসিতেছিল। যাহাদের সন্তান হইত না সেই সন্তানহীন পিতামাতা মন্দিরে দেবতার কাছে মানত করিতেন যে সন্তান হইলে প্রথম সন্তান দেবতার সেবায় অর্পণ করিবেন। এইরূপে প্রথমজাত কন্যা সন্তান যাহাদিগকে মন্দিরে দেব-সেবায় দান করা হইত তাহারা বড় হইয়াও মন্দিরে নৃত্য-গীতাদি করিয়া দেবতার প্রীতিসাধন ও সেবা করিয়া জীবন কাটাইয়া দিত। এই করিয়া দেবদাসীর উৎপত্তি ও সৃষ্টি হইয়াছিল। এরূপ উৎসর্গীকৃত জীবন যতদিন সংযম ও ভক্তি-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল ততদিন তাহা আদর্শস্থানীয় ছিল কিন্তু ক্রমে সময় ও রুচির পরিবর্ত্তনে দেবদাসীর নারীজীবন আদর্শচ্যুত হইয়া কামকলুষিত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য মন্দিরে দেবদাসী থাকা কুপ্রথা বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে আইন করিয়া গত ১৯২৯ সাল হইতে মন্দিরে দেবদাসীর স্থান তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আর দেবদাসী-নৃত্যের মঞ্জীর ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হয়না। দেবদাসী নৃত্যের আদর্শ লইয়া আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ ও নারী নৃত্যশিল্পীগণ যে নৃত্যকলা দেখাইয়া থাকেন সে দেবদাসীর

অবসান ও লোপ হওয়ায় তাহার নৃত্যকলার আদর্শ ও সৌন্দর্য্য কতদিন বাঁচিয়া থাকিবে তাহা বলিতে পারি না।

দাক্ষিণাত্যে যে সকল মন্দির দেখিলাম তাহার অধিকাংশই শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দিরের সংখ্যা কম। বিষ্ণুকাঞ্চি এবং শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরই প্রধান। দাক্ষিণাত্যে শৈব এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের পার্থক্য লইয়া বিবাদ থাকিলেও অনেক মন্দির দেখিলাম যেখানে একই মন্দিরে শিব এবং বিষ্ণুমূর্ত্তি দুইই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এরূপ থাকা সত্ত্বেও এবং শিব ও বিষ্ণু এক বিশ্বস্রষ্টা মহাশক্তির দুই বিভিন্নরূপের প্রতীক জানিয়াও এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ দেখিয়া মনে হয় মানুষ তাহার ধর্ম্মজীবনে শুধু বাহিরের আবরণ লইয়াই যেন অধিক ব্যস্ত। প্রকৃত ভক্তির ও অনুভূতির স্থান তাহার অন্তরে থাকিলে জাতীয় ধর্ম্মজীবন অন্যরূপ ধারণ করিত। দাক্ষিণাত্যে এই সকল দেবস্থান ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষদিগের অন্তরে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি বা বিদ্বেষ থাকিলে আমরা এই সকল বিরাট ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান আজ আদৌ দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। দেশে যখন কোন রেলপথ বা চলাচলের সুবিধা ছিল না সেই প্রাগৈতিহাসিক দিনে কত দূরদেশ হইতে অন্য

একস্থানে আসিয়া কত দানশীল মহাপ্রাণ ব্যক্তি সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পেই এই সকল দেবমন্দির স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবনে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকভাব মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতাদিগের সাধু উদ্দেশ্যের অবমাননাই করিতেছে। হরিজনদিগের মন্দির প্রবেশাধিকার লইয়া বর্ত্তমান আন্দোলনের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের এই সকল মন্দিরে ব্রাহ্মণজাতিকে দেবতার গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। কিন্তু তাঁহাদিগকে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে আর হরিজনদিগের তথায় প্রবেশাধিকার থাকিবে না এরূপ পার্থক্য দূর করিবার জন্য অথচ হরিজনগণ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ সকল অবস্থায় দেবতার গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলে দেবতার শুচিতারক্ষা করা কঠিন বিবেচনায় দাক্ষিণাত্যের সকল জাতিই মূল মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া সকলেই দেবতার গর্ভমন্দির-প্রকোষ্ঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেবতার পূজার্চ্চনা করাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত দেখিলাম।

সংস্কৃত কাব্যে একটি বর্ণনা পড়িয়াছিলাম—এমন স্থান নাই যেখানে সরোবর নাই, এমন সরোবর নাই যাহাতে পদ্ম নাই আর এমন পদ্ম নাই যাহাতে ষট্‌পদ বসিয়া

নাই। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধেও আমার মনে হয় এমন স্থান নাই যেখানে দেবমন্দির নাই, এমন মন্দির নাই যাহাতে মণ্ডপ ও গগনস্পর্শী গোপুরম্ নাই—আর এমন গোপুরম কি মণ্ডপ নাই যাহাতে শিল্প সৌন্দর্য্যের পদ্ম ফুটিয়া নাই। এই পর্য্যটনে যেথানে যে কয়টি মন্দির দেখিয়াছি তাহাদের সবিশেষ বর্ণনা আগেই করিয়াছি। সারা ভারতবর্ষই মন্দিরে পরিপূর্ণ। উত্তর ভারতে গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি যে কয়েকটি স্থানে মন্দির দেখিয়াছি দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির সহিত তুলনায় তাহাদিগের শিল্প কারুকার্য্যের বিশেষ কোন বিশিষ্টতা বা আড়ম্বর নাই। দাক্ষিণাত্যের মন্দির মাত্রেই স্থাপত্যশিল্প কোন-না-কোন একটা রূপ গ্রহণ করিয়া আছে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যেন ভাস্কর্য্যে পরিস্ফুট হইয়া এই মন্দিরগুলিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তর ভারতে যে সব সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদ আছে তাহাদের একটি দেখিলেই সবগুলি দেখার কার্য্য হইয়া যায় বলা যাইতে পারে। তাহাদের গঠন এবং গম্বুজ একই প্রকারের—আকারে ছোট বড় মাত্র। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি প্রত্যেকটি তাহার নিজস্ব শিল্পসম্পদ ও কারুকার্য্য লইয়া তীর্থযাত্রী ও দেশ পর্য্যটককে যুগযুগান্তর

হইতে আহ্বান করিতেছে। তাহার নির্ম্মাণকৌশল ও স্থাপত্যসৌন্দর্য্য দেখিবার উৎসাহ আনন্দ কখন হ্রাস হয় না। তাজমহলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি এবং তাহার নিকট বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিয়াছি। উত্তর ভারতের তাজমহলসৌধ পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য্যের মধ্যে পরিগণিত তাহাতে দ্বিমত নাই। কিন্তু তাঞ্জোর শ্রীরঙ্গম বা মাদুরার মন্দির পৃথিবীর আশ্চর্য্য জিনিষের পর্য্যায়ভুক্ত কেন যে হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। স্থাপত্যশিল্পজগতে এগুলি যে অত্যাশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যের বৃহৎ মন্দিরগুলির উচ্চ প্রাকার বিরাট গোপুরম তোরণ দ্বার মন্দিরাভ্যন্তরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিশাল সরোবর—সভামণ্ডপ ও সুদীর্ঘ অলিন্দ প্রভৃতি দেখিলে তাহার নিকট উত্তর ভারতের মুঘলবাদসাদিগের একমাত্র ফতেপুরসিক্রি ব্যতীত আগ্রা দিল্লী আদির কেল্লাস্থিত প্রাসাদাদির স্থাপত্য শিল্প যে কত নিম্ন স্তরের তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। দাক্ষিণাত্যের অনেক দেবমন্দির সমুদ্রকূলে বা পর্ব্বত শিখরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশালত্বের মধ্যে অবস্থিত। দেবতার সাধনা করিবার ও সাক্ষাৎ পাইবার পক্ষে ঐরূপ স্থানই প্রশস্ত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্থান ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের অন্য

স্থানেও যে সকল বিরাট মন্দিরগুলি দেখিলাম তাহা দেখিয়া যেন জীবন নূতন পূর্ণতা লাভ করিল—জীবনের কত সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া গেল—অন্তর নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইল। কতকাল পূর্ব্বে কোন মনীষীর কি অসাধারণ প্রেরণায় কোন শুভ মুহূর্ত্তে এই মন্দিরগুলি ও তাহাদিগের অক্ষয় কারুকার্য্য নির্ম্মিত হইয়াছে—কত অলৌকিক কাহিনী মন্দিরগুলির ও তাহাদিগের দেবদেবীর সহিত জড়িত রহিয়াছে অতীত ইতিহাসের অন্ধকার গর্ভে সে সকলের কি সত্য নিহিত আছে তাহা জানিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের এই বিরাট মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া শুধু কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"কথা কও কথা কও
অনাদি অতীত……
……অচেতন তুমি নও
কথা কেন নাহি কও ?
হে অতীত তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও কথা কও !"